মা হওয়ার দিনগুলোতে

উম্মু হাসান বিনতু সালিম

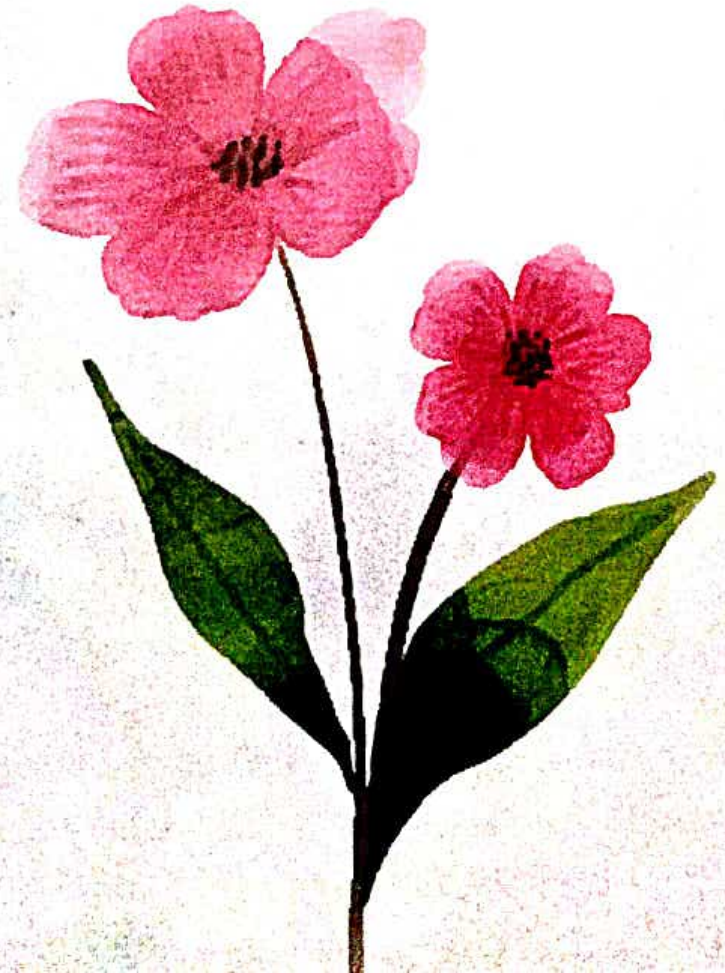

সুকুন

পাহাড় বেঁয়ে নেমে আসা একটি কলকল ধ্বনির ঝর্ণা। টলটলে পানির সেই ঝর্ণা যেন প্রাকৃতিক আয়নার মতো—নিজের চেহারা দেখা যায়। যতোখানি পথ যায়, সেই ঝর্ণা ধুঁয়ে-মুছে যায় সবকিছু। পাহাড়ের গায়ে জমে থাকা শ্যাওলা, জমতে থাকা ধুলো কিংবা স্তুপাকার হয়ে থাকা আবর্জনা—স্রোতের টানে সমস্তটাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে। স্রোতের এই কাজ ঝর্ণার চারপাশে এনে দেয় একটা শুদ্ধতা এবং সজীবতার আবহ। যেন চারপাশে প্রশান্তি লাভের সমস্ত আয়োজন।

সুকুন শব্দের অর্থ হলো প্রশান্তি। সুকুন পাবলিশিং ঝর্ণার সেই স্রোতের কাজটাই করতে চায় যা আমাদের অন্তরে জমা অবাধ্যতার শ্যাওলা, অশুদ্ধতার ধূলো এবং অশ্লীলতার আবর্জনাকে ধুয়েমুছে দিবে। অন্তরগুলোকে ভরে তুলবে প্রশান্তিতে। আমাদের হৃদয়-মন হবে সেই ঝর্ণাপাড়ের মতো যার চারপাশে বিরাজ করে শুদ্ধতা আর সজীবতার অপার্থিব আবহ...

সুকুন পাবলিশিং
শব্দে আঁকা স্বপ্ন

মা হওয়ার দিনগুলোতে

উম্মু হাসান বিনতু সালিম

সম্পাদনা: আরিফ আজাদ

সুকুন পাবলিশিং

সূচি

প্রকাশকের কথা ৭
সম্পাদকের কথা ৯
অনুবাদকের অনুভূতি ১২
শুরুর কথা ১৪

শুধুই আপনি

অভিনন্দন! ২১
একজন মা হয়ে ওঠা ২৩
মহিমাময়ী মা ২৬
একটি সম্পূর্ণ নতুন দৈহিক অভিজ্ঞতা ৩১
সালাতে উন্নতি সাধন ৩৪
রামাদান ও সিয়াম পালন ৩৯
হজ-উমরা ৪৪
আবেগ সংক্রান্ত পরিবর্তন ৪৬
ধৈর্যধারণ ৫৪
শুকরিয়া জানানো ৬০
কোথায় আমার কোমর-রেখা! ৭০
আওরাহ ও দৈহিক আবরণমোচন ৭৪
গর্ভকালীন উদ্বিগ্নতা ৮১
গর্ভকালীন বিষণ্ণতা ৯০
জীবনের সন্ধিক্ষণে মৃত্যুর ভাবনা ৯৪

স্তন্যপান ৯৭
গর্ভবতী নারীর স্বামীরা ১০১

অনাগত অতিথির জন্য

ভালোবাসা, ভালোবাসি ১১১
আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি! ১১৩
তার জন্য বদলে যাব ১১৬
বাচ্চার জন্য কুরআন ১১৯
কান সতর্ক রাখব! ১২২
এখনো বেশি দেরি হয়নি ১২৪
১২০ তম বড়ো দিনের গণনা ১২৭
ন্যায়পরায়ণ রুহের জন্য দুআ করা ১২৮

অপেক্ষার শেষ দিনগুলো

শেষ প্রহরের ভাবনা ১৩৫
জন্ম-পরিকল্পনা ১৩৭
গৃহজন্ম ১৪০
আরও কিছু প্রস্তুতি ১৪২
জন্মদানের সহযোগী ১৪৮
ই.ডি.ডি ১৫১
প্রসবের সময়ে দুআ ১৫৩
কঠিন সময়ের সালাত ১৫৫
ব্যথার উপশম ১৫৭
প্রথম কান্না : শয়তানের ওপর অভিশাপ! ১৬১
নাড়ি ও নাড়িরজ্জু ১৬৪
স্বাগত জানাই তোমায়! ১৬৬
প্রসবোত্তর সময়কাল ১৭০
একটি নতুন জীবনের শুরু ১৭৩

প্রকাশকের কথা

মাতৃত্ব একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতাময় যাত্রা। একটা নতুন প্রাণের আবির্ভাব এবং আগমনী বার্তাকে কেন্দ্র করে একজন মা দীর্ঘ নয়টা মাস কত অপেক্ষার প্রহর গোনেন! কত যত্ন আর ভালোবাসায় আগলে রাখেন সদ্য প্রাণের সঞ্চার হওয়া সেই ভ্রূণটাকে! শত রাতজাগা, শরীরের শত অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও সেই ছোট্ট তুলতুলে মুখখানার কথা ভেবে মা যেন ভুলে যান তার সমস্ত দুনিয়াকেই।

কিন্তু, অনাগত সন্তানকে ঘিরে একজন সাধারণ নারী এবং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী একজন নারীর মাঝে বেশ অনেকখানিই তফাৎ। সন্তানের সাথে তার শেকড়ের, অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে সংযোগ দুনিয়াতে আসার পরে নয়, বরং শুরু করতে হয় ভ্রূণের বিকাশের সাথে সাথেই। ঠিক এ-জন্যেই, ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী একজন গর্ভবতী নারীর জন্য তার গর্ভধারণের সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রূণ বিকাশ লাভের অল্প কিছুদিন পর অনাগত সন্তান শুধু খাবারের ঘ্রাণ কিংবা মায়ের নড়াচড়াই অনুভব করে না, সে অংশীদার হয় মায়ের কথা, চিন্তা এবং ভাবনারও। এই সময়টাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে মায়ের সম্পর্ক যত মজবুত হবে, অনাগত সন্তানের মাঝেও পাওয়া যাবে সেই সম্পর্কের গভীর ছাপ।

আর তাছাড়া, গর্ভধারণের দীর্ঘ নয়মাস একজন নারীর জন্য এক অপূর্ব সুযোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে নিজের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার। এই সময়ে নানাবিধ অসুস্থতা থাকে ঠিকই, কিন্তু

একটু চেষ্টা করলে অসুস্থতা পাশ কাটিয়ে একজন গর্ভবতী নারী নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু, সেটা কীভাবে সম্ভব, তাই তো?

গর্ভাবস্থায় একজন নারী কীভাবে নিজের এবং অনাগত সন্তানের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথেও একটা মজবুত সম্পর্ক তৈরি করে নিতে পারে সে সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা 'Heaven Under Your Feet' নামে মলাটবদ্ধ করেছেন অন্য একজন মা–লেখিকা উম্মু হাসান বিনতু সালিম। বইটিকে গর্ভকালীন সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নৈকট্য লাভের একটা 'গোছানো গাইডলাইন' বললে অত্যুক্তি হবে না মোটেও।

বাংলাভাষী পাঠক, বিশেষ করে সন্তানসম্ভবা মুসলিম নারীদের জন্য বইটি বাংলা ভাষায় 'মা হওয়ার দিনগুলোতে' নামে প্রকাশ করেছে সুকুন পাবলিশিং। অনুবাদ করেছেন বোন আফরা আহমেদ সুজানা এবং ভাষা-সম্পাদনা করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখক আরিফ আজাদ। মহান রব উভয়ের শ্রম এবং প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন, আমিন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের এই কাজ কবুল করেন এবং এটি উম্মাহর জন্য কল্যাণকর বানিয়ে দেন। এই বইটি যদি কিছু মানুষের ভাবনাকেও অন্তত আলোড়িত করে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে, ইন শা আল্লাহ।

বিনীত,
প্রকাশক
সুকুন পাবলিশিং

সম্পাদকের কথা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে দুজন আদুরে কন্যার পিতা বানিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তারা সারাটা দিন আমার ঘর মাতিয়ে রাখে। বাইরে থেকে যখন ঘরে ফিরি, মেয়ে দুটো এমন হুটোপুটি করে ছুটে আসে আমার কাছে—যেন তারা আমাকে কত হাজার বছর ধরে দেখে না! সন্তানসহ যে জীবন, সেটা সত্যিই বড়ো নিয়ামতের জীবন! আলহামদুলিল্লাহ!

কিন্তু, তাদের দুনিয়াতে আসার আগের সময়টুকু, যে সময়ে ওরা ছিল ওদের মায়ের গর্ভে, ওই সময়টা যে তাদের মায়ের জন্য কতটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ছিল তার সাক্ষী আমি নিজে। ভালোভাবে খেতে না পারা, খেলেই বমি হয়ে যাওয়া, কোনো মশলার গন্ধ নাকে গেলে জান বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া, ভোরের আলোকে ভয়াবহরকম অসহ্য লাগা—এই সমস্ত ঝড় পার করতে দেখেছি মেয়েদের মা'কে।

কিন্তু কখনো, একটিবারের জন্যেও তাকে দেখিনি নিজের অবস্থার জন্য অনুতাপে ভুগতে অথবা গর্ভধারণকে বোঝা মনে করতে। বরঞ্চ, এতসব যন্ত্রণা সত্ত্বেও, অনাগত অতিথিদের জন্যে তাকে সর্বদা চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করতে দেখেছি। তার চোখেমুখে থাকত রাজ্যের প্রতীক্ষা—কবে ছুঁতে পারবে আদুরে হাত দুটো? কবে চুমু খাবে তার তুলতুলে গালে?

গর্ভধারণ খুব সহজ কোনো ব্যাপার নয়। তবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অপার ধৈর্য আর মানসিক শক্তি আমাদের মা, বোন, স্ত্রীর মাঝে দান করেছেন বলেই তারা এই দীর্ঘ যাত্রাটা হাসিমুখে সহ্য করতে পারেন। এই মানসিক দৃঢ়তা, এই অসীম ধৈর্যশক্তি জগতের কোনোকিছু দিয়ে

ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাদের এই অপরিসীম ত্যাগের জন্যেই ইসলাম বাবাদের ওপরে সমুন্নত করেছেন মায়েদের মর্যাদা। পিতা-মাতার অধিকারের ব্যাপারে বলতে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের কথা বলেছেন তিন তিনবার। আর বাবার কথা বলেছেন শুধু একবার। অথচ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ছিলেন একজন পিতা!

গর্ভধারণ একজন নারীর জীবনে সবচাইতে বড়ো ঘটনা। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গর্ভধারণকালে নারীরা নৈমিত্তিক রুটিন থেকে ছিটকে যান। যন্ত্রণার ধকল তাদের শুধু স্বাভাবিক নিয়ম থেকেই দূরে সরায় না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে তাদের যে মধুর সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক থেকেও অনেক সময় তারা দূরে চলে যান। সালাত-সিয়ামসহ দৈনন্দিন ইবাদাতে হয়ে পড়েন ভীষণ অনিয়মিত। কিন্তু, একজন মুমিন নারীর জীবনে এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না।

গর্ভধারণকালে একজন নারী কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে নিজের সম্পর্ক মজবুত রাখতে পারবে, কীভাবে এই সময়ের যাবতীয় ধকলের মাঝেও তিনি সময় করতে পারবেন নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং সর্বোপরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, কীভাবে অনাগত সন্তানের জন্য তিনি একটা অসাধারণ প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন গর্ভধারণের একেবারে প্রথম দিন থেকে—সেই বিষয়ের ওপর লেখিকা উম্মু হাসান বিনতু সালিম দুর্দান্ত একটি বই লিখেছেন 'Heaven Under Your Feet' নামে। লেখিকা অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন বইটি। গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নারী কীভাবে নিজের এবং নিজের আত্মার পরিচর্যা করবেন, কীভাবে উন্নত করবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে নিজের সম্পর্ক—সেই আলোচনাগুলো রেখেছেন বইয়ের একেবারে শুরুতে। বইয়ের দ্বিতীয় অংশে স্থান দিয়েছেন অনাগত সন্তানদের ঘিরে ভাবনা এবং করণীয়গুলো। বইটির শেষাংশে লেখিকা গর্ভধারণের চূড়ান্ত মুহূর্ত তথা প্রসবের সময়কাল এবং তদপরবর্তী সময়ের কিছু জরুরি বিষয়ে নারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমাদের সমাজে গর্ভধারণ নিয়ে এখনো অনেক কুসংস্কার, ভয় এবং অস্বস্তি রয়ে গেছে। এই বইটি বাংলাভাষী মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলেই আমার বিশ্বাস, ইন শা আল্লাহ। 'মা হওয়ার দিনগুলোতে' নামে প্রকাশিত হতে যাওয়া বইটির ভাষাগত দিক সম্পাদনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটি প্রকাশিত যাচ্ছে সুকুন পাবলিশিং থেকে।

সম্পাদকের জায়গা থেকে একটি কথা না বললেই নয়। লেখিকা এই বইটি যে অঞ্চলের মানুষদের কথা ভেবে লিখেছেন সেই অঞ্চলের মানুষের সাথে আমাদের অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং সংস্কৃতিতে কিছুটা পার্থক্য আছে। তাই, সম্পাদনার সময় আমি আমাদের অঞ্চলের মানুষের চিন্তা আর সংস্কৃতির বিষয়টি মাথায় রেখেছি। সে কারণে, মূল বইয়ের কিছু অংশ আমাকে বাদ দিতে হয়েছে, কোথাও হয়তো-বা যুক্ত করতে হয়েছে নতুন কিছু। যদিও কাজটা খানিকটা বেখাপ্পা, কিন্তু আমাদের দেশীয় পাঠকদের কথা চিন্তা করে সেটুকু আমাকে করতেই হলো। এ-জন্যে আমি প্রথমে বইটির লেখিকা এবং আমাদের পাঠক—উভয়ের কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী।

গর্ভধারণের সময় একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে খুব উপকারী কিছু উপহার দিতে চায়, 'মা হওয়ার দিনগুলোতে' বইটি হতে পারে সেই উপকারী উপহার। মহান রব কাজটি কবুল করে নেন। আমিন। ওয়ামা তাউফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আরিফ আজাদ
knock.arifazad@gmail.com

অনুবাদকের অনুভূতি

একজন মুসলিমের সকল কাজের একটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, আর তা হলো—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যই যেন সফল হয়, সে-লক্ষ্যে তিনি সর্বদাই সজাগ এবং সচেষ্ট থাকেন। তাহলে, একজন মুসলিম নারীর 'মা' হয়ে ওঠার মতো একটি মর্যাদাপূর্ণ যাত্রায়, 'রহমান'-এর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আলহামদুলিল্লাহ! আরশের মালিকের অশেষ রহমতে 'মা হওয়ার দিনগুলোতে' বইটি অনুবাদ করার সুবাদে এর কদরটা যেন আরও অধিক মাত্রায় এবং ভিন্ন আঙ্গিকে বোঝার তাউফিক পেয়েছি।

বর্তমান যুগের প্রগতিশীল যাত্রায়, নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মধ্যে 'মা' হয়ে ওঠার বিষয়টি অন্যতম; কিন্তু একজন মুসলিম নারীর ব্যাপার একেবারেই আলাদা। তার জন্য এটি কোনো চ্যালেঞ্জ নয়, বরং আল্লাহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাওয়া নিয়ামত। কারণ, তিনি জানেন—তার সকল পদক্ষেপেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রহমতের চাদর বিছিয়ে রেখেছেন। আর তাই, তার এই মা হয়ে ওঠার যাত্রা যেন সাবলীল ও কার্যকর হয়, সেই লক্ষ্যে এই বইটি সহায়ক হিসেবে পথ দেখাবে বলে আশা করি, ইন শা আল্লাহ।

মা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক। তাই গর্ভকালীন মুহূর্ত থেকেই সন্তানকে 'মালিক'-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া একজন মায়ের কর্তব্য। ভাবছেন, এই প্রচেষ্টার প্রথম ধাপটি কীভাবে শুরু করবেন, তাই তো?

লেখিকা উম্মু হাসান বিনতু সালিম সেই উপায়গুলোই বইতে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে। এর প্রতিটি ভাঁজে রয়েছে কুরআন ও হাদিসের আলোকে আঁকা গর্ভকালীন সময়ের শুরু থেকে শেষ অবধি বিভিন্ন দিক-নির্দেশ। একজন গর্ভবতী মুসলিম নারী তার এই বিশেষ সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সান্নিধ্যে কাটাতে পারেন তার-ই একেকটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে এই বইয়ে। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, তাই গর্ভকালীন সময়ে ইসলামের পরশ থেকে কোনো মুসলিম নারী যেন ছিটকে না পড়েন, তার-ই একটি চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি—এই মহান প্রচেষ্টায় লেখিকা পুরোপুরি সফল।

সব শেষে দুআ করি, এই গোছানো গাইডলাইনটির অনূদিত রূপটি যারা পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার মহতি উদ্যোগ নিয়েছেন, তাদের সকলকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করে নেন। বইটির দ্যুতি পাঠকসমাজে ছড়িয়ে পড়ুক এবং সকলের অন্তরকে ছুঁয়ে যাক, ইন শা আল্লাহ, আমিন।

শুরুর কথা

প্রথমবার মা হওয়াটা ছিল আমার জীবনের এক বিশেষ মুহূর্ত। এই সময়টাতে সঠিক এবং কার্যকর পরামর্শের জন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও এই বিষয়ের ওপর লিখিত বইয়ের ওপর। সেই সংকটপূর্ণ সময়টা স্বাভাবিকভাবে পার করার জন্য সকলের সহযোগিতা ও আস্থা আমার অতি-অবশ্যই দরকারি ছিল বটে, তবে তখন বই-ই ছিল মূলত আমার একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। গর্ভকালীন সময়কে ঘিরে আমার প্রত্যাশা ও করণীয়-বর্জনীয়সহ যাবতীয় বিষয়াদি আমি বই পড়েই জানতে পারি। বলা চলে, গর্ভাবস্থার প্রথম দিক থেকেই বইয়ের সঙ্গ আমাকে পরিপূর্ণ গর্ভকালীন অবস্থার স্বাদ দিয়েছে।

তবে আমার পঠিত বইয়ের বেশিরভাগই ছিল অমুসলিম লেখিকাদের রচিত। সেগুলোর ব্যাখ্যাও কেবল অমুসলিম নারীদের বেলায় প্রযোজ্য বলেই মনে হয়েছে আমার। কারণ, একজন গর্ভবতী মুসলিম নারী হিসেবে আমার এমন কিছু প্রশ্ন ছিল, যার উত্তর বা কোনো ব্যাখ্যা আমি বইগুলোতে পাইনি। এই যেমন, গর্ভে বেড়ে ওঠা নতুন সত্তার সাথে একজন ফেরেশতার সাক্ষাৎ, তার ভাগ্যলিপির লিখন এবং মাংসপিণ্ডে রূহের সঞ্চার—এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো তথ্য সে-সব বই আমাকে দিতে পারেনি। ওপরন্তু কিছু কিছু বইতে এঁকে রাখা অসঙ্গত ছবি দেখার পর নিজেকে ওই অবস্থায় ভাবতেও আমার অস্বস্তি হচ্ছিল; সেখানে ব্যাপারটা নিয়ে আমার স্বামীর সাথে আলোচনা করা তো ছিল অনেক দূরের বিষয়!

বইগুলো পাঠ করার সময় যে বিষয়টার ভালো রকমের ঘাটতি চোখে পড়ছিল, তা বলতে গেলে বলতে হবে, সেটা ছিল—আধ্যাত্মিকতা।

গর্ভাবস্থার সময়টাতে মহান রবের খুবই নিকটবর্তী হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বইগুলোতে আত্মিক বিষয়গুলোর চেয়ে বাহ্যিক দিকটার আলোচনাই বেশি। কিছু কিছু মুহূর্তে সন্তান-কেন্দ্রিক চিন্তাই শুধু আমার ভাবনাজুড়ে জেঁকে বসত। সন্তানকেই মনে করতাম আমার জীবনের সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু। অথচ একজন মুসলিম হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতই আমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তাই, শুধু সন্তান-কেন্দ্রিক যে চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, সেই চিন্তাকে বদলে নিজের ভেতরে নতুন চিন্তা আনয়ন আমার জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন কারিমে বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন ও মানবজাতিকে এ-জন্যেই সৃষ্টি করেছি
যে—তারা শুধু আমারই ইবাদাত করবে।[১]

আলহামদুলিল্লাহ, গর্ভকালীন সময়ের আগের এবং পরের করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে ইসলামি সাহিত্যে অনেক বইপুস্তক রচিত হয়েছে। তবে গর্ভকালীন সময়ে কী কী করণীয় সে বিষয়ে লিখিত বইপত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই, বিশেষ এই সময়ে মুসলিম নারীদের আত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই বইটির অবতারণা। আমার প্রত্যাশা—অন্তঃসত্ত্বা মুসলিম নারীদের জীবনের অসাধারণ এই সময়টাতে এই বই গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী হয়ে উঠবে, ইন শা আল্লাহ।

এই বইয়ের প্রতিটি বিষয় লেখা হয়েছে বর্তমান সময়ের মুসলিম নারীদের চিন্তা মস্তিষ্কে রেখেই। সমসাময়িক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে। বলা চলে—এটিই এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একজন গর্ভবতী নারী প্রতিদিনকার জীবনে যেসব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন, সেগুলো সবিস্তার আলাপ করেছি

[১] সূরা আয-যারিয়াত : ৫১ : ৫৬

আমি। তাছাড়া মা এবং গর্ভের সন্তানের আত্মিক উন্নতি সাধনের বিষয়ও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখার চেষ্টা করেছি আমি।

বইটি সাজানো হয়েছে তিনটি আলাদা আলাদা স্তরে। শুরুর আলোচনা নিজেদের, অর্থাৎ একজন গর্ভবতী নারীকে ঘিরেই। তাই এই অংশের নামকরণ করা হয়েছে 'শুধুই আপনি।' এই শিরোনামে গর্ভবতী নারীদের চিন্তাভাবনা, গর্ভকালীন সময়ের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো এবং এই সময়ে তাদের নানাবিধ অভিজ্ঞতাগুলো স্থান পেয়েছে। বইয়ের দ্বিতীয় অংশের শিরোনাম—'অনাগত অতিথির জন্য।' এই অংশে আছে আমাদের ভেতরে বেড়ে ওঠা সেই নতুন সত্তার আলোচনা, তাকে ঘিরে নতুন মা হতে চলা একজন নারীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং একটি উত্তম জীবন শুরু করার প্রয়াস। বইয়ের শেষ অংশটি সাজানো হয়েছে গর্ভকালীন সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তটা ঘিরে। 'অপেক্ষার শেষ দিনগুলো' শিরোনামের এই অংশে একজন গর্ভবতী নারীর শেষ মুহূর্তগুলোর অনুভূতি, প্রসবকালীন সময়ের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি এবং আশু ফলাফল নিয়ে তার চিন্তাভাবনাগুলো স্থান পেয়েছে।

বলে রাখা ভালো—গর্ভকালীন সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপদেশ অগ্রাহ্য করা বইটি লেখার উদ্দেশ্য নয়। বরং বইটি সোফিয়া ওডুগলেহ নামক একজন মুসলিম ধাত্রীর দ্বারা অনুমোদিত এবং মুসলিম চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে লিখিত। গর্ভাবস্থার এই সময়ে কার্যকর পরামর্শের জন্য আমাদের অবশ্যই চিকিৎসক ও ধাত্রীর সাহায্য নিতে হবে। তাই এই সময়ে একজন নারী ও অনাগত সন্তানের যেসব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে সে-সব বিষয়ে কোনো গভীর আলোচনা এই বইয়ে করা হয়নি। এসব বিষয় নিয়ে চমৎকার বই মজুদ আছে। কেউ ইচ্ছা করলে সেই বইগুলোকেও পাঠ্য-তালিকায় রাখতে পারেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো—আমার এ বইটি শরিয়াহর কোনো মুহাক্কিক আলিমের বিকল্পও নয়। কেননা, গর্ভকালীন সময়ে এমন কিছু ব্যাপার থাকে যে বিষয়ে একজন

ভালো আলিমের পরামর্শই গ্রহণ করা উচিত। যেমন, রামাদানে সিয়াম পালন করা এবং প্রসবোত্তর রক্তপাত বিষয়ে করণীয় ধর্মীয় বিধান ইত্যাদি। আমি চেষ্টা করেছি ইসলামি আইনগত কোনো তথ্য এই বইয়ে না রাখতে এবং পাঠকদের অনুরোধ করব এ-বিষয়ে তারা যেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিজ্ঞ আলিমের পরামর্শের অনুসরণ করেন। যেকোনো স্থানীয় মসজিদে আমরা আমাদের জিজ্ঞাসাগুলো জানাতে পারি। অথবা দেশ ও বিদেশের যে-কোনো ইসলামি প্রতিষ্ঠানে ফোনকলে যোগাযোগ করেও পরামর্শ নিতে পারি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমার এই প্রয়াস তাদের জন্য উপকারী করে তোলেন, যারা এই বইটি পড়বেন; এবং তার উসিলায় আমার গুনাহগুলো যেন মাফ করে দেন।

শুধুই আপনি

অভিনন্দন!

অভিনন্দন, আপনি মা হতে চলেছেন!

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের দুআগুলো কবুল হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে একটি উত্তম উপহার আমাদের মধ্যে বেড়ে উঠছে। আমাদের অনেকেই প্রথমবার মা হওয়ার এই মধুর স্মৃতিটি পরম যত্নে আগলে রাখেন। এই সময়ে একজন নারী যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যান।

গর্ভাবস্থা কেবল একটি শারীরিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি উত্তেজনা, আশংকা, আনন্দ ও বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে পরিপূর্ণ একটি মনস্তাত্ত্বিক আবেগময় যাত্রা। একজন মায়ের জন্য এই সময়টি বড়ো রকমের মানসিক পরিবর্তন ও প্রস্তুতির সময়। কারণ, এই মুহূর্ত থেকেই মাতৃত্বের জীবনব্যাপী এক যাত্রা শুরু হয়।

মুসলিম এবং অমুসলিম সকল নারীই তাদের নিজ নিজ সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম জিনিসই প্রত্যাশা করেন। আমরা প্রত্যেকে জানি যে—মা হওয়া মানে কেবল সন্তানকে সেরা পুশচেয়ার, সুন্দর পোশাক, দুধ কিংবা দামি খেলনা কিনে দেওয়া নয়; বরং একজন নারীর পরিপূর্ণ স্বার্থকতা লুকিয়ে থাকে মা হিসেবে সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টার মাঝেই। একজন উত্তম মা হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে কেবল সন্তানের জন্য একগাদা কেনাকাটা করলে যথেষ্ট হবে না, বরং দুআ, পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার সম্মিলনে নিজেদের ঢেলে সাজাতে হবে।

নয় মাসের এই বিশেষ সময়টাকে অনেক নারীই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথে প্রত্যাবর্তনের সুবর্ণ সময় বলে মনে করেন। নিজেদের

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পরিবর্তনের জন্য এই সময়টিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকি। নিজেদের আচার-আচরণ, বাহ্যিকতা ইত্যাদি নিয়ে খুব সচেতন হয়ে যাই; কারণ, অনাগত নতুন অতিথির প্রথম শিক্ষক হবো আমরাই। তারা আমাদের দেখে অনেককিছু রপ্ত করবে। ব্যাপারগুলো নিয়ে আগে হয়তো কখনো ভাবিনি; কিন্তু যে নতুন সত্তা আমাদের উসিলায় দুনিয়ায় আসতে যাচ্ছে, তাকে সর্বোত্তম পন্থায় বড়ো করতে গেলে এ-সকল আত্মিক প্রস্তুতি আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে।

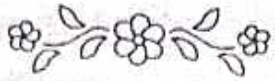

একজন মা হয়ে ওঠা

'সন্তান ধারণের বিষয়টি আদতে বিশেষ কোনো যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নয়। সন্তানের ভরণপোষণের আর্থিক দায়িত্ব, মানসিক যন্ত্রণা এবং তাদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে পার করা যাবতীয় ঘুমহীন রাত—এ-সব নিয়ে যদি খানিকটা চিন্তা করা হয়, তাহলে আমরা অনেকেই হয়তো সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসব।'

আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তিটি হাস্যকর মনে হলেও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সন্তান জন্মদানের বিষয়ে বর্তমানে বহু নারীর চিন্তাভাবনা ঠিক এ-রকমই। গেনলে তার উক্তির সাথে আরও যুক্ত করেন—

> 'তাহলে, কেন অধিকাংশ নারীর সিদ্ধান্তকে সকল নারীর পছন্দ বলে চালিয়ে দেওয়া হবে?'

তিনি যদিও একটি মজাদার প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু প্রশ্নটার কোনো উত্তর তিনি দেননি। তিনি জানতে চেয়েছেন—কেন আমরা মা হতে চাই। এই প্রশ্নের সদুত্তর যেহেতু তার কাছে পাওয়া যায়নি, প্রশ্নটা আমরা নিজেরাই নিজেদের করতে পারি।

সন্তান ধারণের ব্যাপারটিকে 'আমি মা হতে চাই' না বলে আমরা অধিকাংশই বলি—'আমি বাচ্চা নিতে চাই'। বাচ্চারা খুবই মিষ্টি ও আদরণীয় হলেও মা হতে চাওয়ার ব্যাপারটি অনেকটাই বিষণ্ণ আর ক্লান্তিকর দায়িত্বে ভরপুর। সম্ভবত, একটি নতুন সত্তাকে নিজের ভেতরে ধারণের বিষয়টি যখন জানতে পারি, তখন থেকেই মা হওয়ার অনুভূতিটা আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করি!

'আমরা কেন মা হতে চাই'—এই প্রশ্নটি খুবই আবশ্যকীয়; কেননা, এর সাথে মা হতে চাওয়ার উদ্দেশ্য জড়িয়ে আছে। আর এই প্রশ্নটি তখনই আসে যখন কিনা মা হতে চাওয়ার ব্যাপারটি আমরা প্রথম বারের মতো চিন্তা করি। এই যে মা হতে চাওয়ার ইচ্ছা, এর গুরুত্ব সর্বোচ্চ, কারণ—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়ত বা ইচ্ছার ওপর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যা সে ইচ্ছা করে।'[১]

সন্তান নিতে চাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর গুরুত্ব বিবেচনার জন্য আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসটির ওপর আলোকপাত করতে পারি। সন্তান ধারণের বেলায় যদি আমাদের উদ্দেশ্য উত্তম এবং পবিত্র হয়, তাহলে সন্তানদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমাদের আমলনামায় সাওয়াব যুক্ত হতে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই যদি বাচ্চা নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ধরে নিতে পারি—আমাদের গর্ভাবস্থা, সন্তান এবং তাদের সাথে কাটানো আমাদের জীবন, সবকিছুই ফলপ্রসূ হবে, ইন শা আল্লাহ। আর মা হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর এই অশেষ রহমত অর্জনের দৃঢ় আস্থাই আমাদের সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এখন তাহলে গেনলের উত্থাপিত প্রশ্নের (কেন অধিকাংশ নারী সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?) উত্তরে আমরা ফিতরাত তথা সহজাত মানব-প্রকৃতির কথা বলতে পারি। মুসলিম হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করা আমাদের ফিতরাত। উত্তম পরিবার গঠন এবং উত্তম বংশ বৃদ্ধির বাসনাও ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। সন্তান নেওয়ার কামনা এবং মা হওয়ার ইচ্ছা লালন করাও এক ধরনের ফিতরাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।'[২]

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪

[২] হুবহু এ হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে এ হাদিসের ভাবার্থ অন্য আরেকটি সহিহ হাদিসে ফুটে উঠেছে—মুআবিয়া ইবনু জাহিমা সালামি রাহিমাহুল্লাহ

মা হওয়ার সহজাত ইচ্ছাটি খুব সুন্দরভাবে এই হাদিসে উঠে এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের বুঝিয়েছেন যে—জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে মাতৃত্ব অত্যধিক মূল্যবান এবং জীবনের উদ্দেশ্যের অখণ্ড অংশ। মা হিসেবে সন্তানের জীবনে একজন নারীর এই ভূমিকা এবং তার প্রতিফল তাকে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ স্বাদ এনে দেবে, ইন শা আল্লাহ।

বলেন, আমার পিতা জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এখন সে ব্যাপারে আপনার কাছে মতামত জানতে এসেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বলল—হ্যাঁ, তিনি জীবিত আছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তার খেদমতে লেগে থাকো। কেননা, জান্নাত তার দুই পায়ের নীচে। সুনানুন নাসায়ি, হাদিস : ৩১০৪

মহিমাময়ী মা

গর্ভকালীন সময়ে আমাদের জীবনে মায়ের মর্যাদা এক নতুন রূপে ধরা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে আমরা আমাদের মায়েদের ভোগকৃত সকল কষ্ট নিজেদের মতো করে অনুভব করতে পারি। আর সত্যি বলতে এই পর্যায়ে এসেই আমরা কেবল মাতৃত্বের আসল স্বাদ আস্বাদন করতে পারি। পবিত্র কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা মাতৃত্ব, গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যপান করানো বিষয়ে ঘোষণা করেছেন—

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। (কেননা,) তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করে এবং কষ্টের সাথে প্রসব করে। তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে—হে আমার রব, আপনি আমাকে সামর্থ্য দেন—যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি আমার

প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের সৎকর্মপরায়ণ করে দেন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।[১]

কুরআন কারিমের আরেক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।[২]

গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যপান করানোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটি নির্দেশনা দিয়েছেন—

* মাতা-পিতার সাথে ভালো আচরণ করা;
* আল্লাহ তাআলা এবং মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

এই পৃথিবীর আলো দেখার আগ থেকেই মা আমাদের ভালোবেসেছেন এবং গর্ভকালীন সময়ের সকল কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেছেন। না দেখেই আমাদের জন্য তারা সকল কষ্ট আলিঙ্গন করে নিয়েছেন। পৃথিবীর সকল নিয়ামতের জন্য যেমনটা আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞ, ঠিক তেমনি বাবা-মায়ের প্রতিও আমরা সমান ঋণী। যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু

[১] সূরা আহকাফ, আয়াত : ১৫
[২] সূরা লুকমান, আয়াত : ১৪

ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না, ঠিক তেমনি বাবা-মায়ের ঋণও কখনো শোধ করা যায় না।

একজন সন্তান কখনোই তার বাবার ঋণ শোধ করতে পারে না; যদি না সে তার বাবাকে কৃতদাস হিসেবে পায় এবং তারপর তাকে মুক্ত করে দেয়।[১]

আবু বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত, আবু বুরদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি একবার ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন, ইয়েমেনের এক ব্যক্তি তার মাকে পিঠে বহন করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর কবিতা আবৃত্তি করে বলছিল—

'আমি তো আমার মায়ের কাছে
নিজেকে মনে করি উটের মতো।
আমি তার পায়ে আঘাত পেলেও
তা সহ্য করি, মনে করি না কোনো ক্ষত।'

এভাবে নিজের মাকে পিঠে বহন করে তাওয়াফ করতে করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ওই লোক ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন—

> 'আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন?

জবাবে ইবনু উমার বললেন—

> 'কখনোই নয়; তোমার মায়ের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও তুমি এখনো দিতে পারোনি।[২]

মাঝে মাঝে গর্ভাবস্থায় নিজেদেরকে 'বাবা-মা'রূপে কল্পনা করি। বিশেষ করে প্রথমবার মা হওয়ার সময়টাতে কল্পনার সরোবরে সাঁতরাই। এসব কল্পনায় সবার আগে নিজেদের বাবা-মায়ের কথাই মাথায় আসে। তবে এখন বাবা-মা হওয়ার উপলক্ষ কেবলই আমাদের। সেই হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য এটি উত্তম সময়। গর্ভকালীন সময়ের নয়টি মাস হলো

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫১০
[২] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ৭৫৫০; আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১

মাতৃত্ব জীবন শুরু করার এক অভূতপূর্ব অনুভূতি—যা আমাদের জীবন থেকে আলাদা নয়, বরং জীবনের সাথে মাতৃত্বকে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

মা হয়ে ওঠা বিশাল একটা ব্যাপার এবং এর অনুভূতি সত্যিই অসাধারণ। সন্তানের জন্য আমরা কত রাত নির্ঘুম কাটিয়েছি, কত অর্থ তাদের পেছনে ব্যয় করেছি, কতটা সময়, শ্রম ও কষ্ট তাদের জন্য বরাদ্দ করেছি—এসব দিয়ে মাতৃত্বের বিশালতা কখনোই পরিমাপ করা যায় না; বরং সন্তানের কাছে কতটুকু কাছের, কতখানি আপন হয়ে উঠতে পেরেছি—সেটাই মুখ্য।

নবীজি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'প্রতিটি শিশু ফিতরাত তথা সত্য ধর্মের ওপরে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদি-খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারি বানিয়ে ফেলে; যেভাবে চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। আচ্ছা, তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনোটার কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষই তার নাক কান কেটে দেয় বা ছিদ্র করে বিকৃত করে থাকে।)'[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি—সন্তানকে ফিতরাত তথা সত্য ধর্মের ওপর বড়ো করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। এই বিষয়গুলো বাচ্চারা কখনোই একা একা শিখতে পারবে না। আমরা নিজেরা কোনো দায়িত্ব পালন না করে যদি তার সম্পূর্ণ ভার আল্লাহ তাআলার ওপর চাপিয়ে দিই, তাহলে ন্যায়সঙ্গত হয় না। তাই সন্তান দুনিয়াতে আসার আগেই যদি আমরা তাদের ফিতরাতের ওপর বড়ো করার চিন্তাভাবনা করতে থাকি এবং সে মোতাবেক নিজেদের প্রস্তুত করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের সন্তান একজন উত্তম মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠবে। এছাড়া একজন উত্তম মুমিন হিসেবে নিজেকে দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাদের নিজ চরিত্র হিফাজত করতে হবে এবং ঈমান বৃদ্ধি করতে হবে। বাবা-মা হিসেবে সন্তানের জন্য আমরা হয়ে উঠতে পারি অনুসরণীয়। তাই গর্ভাবস্থার সময়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিতে হবে

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৮৫

এবং শেখার গতি চলমান রেখে একে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে; এই ক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইসলামি বই পড়তে পারি এবং যোগদান করতে পারি এই বিষয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার অথবা ক্লাশগুলোতেও।

সন্তানদের সত্যিকার মুসলিম হিসেবে বড়ো করে তোলা বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আন্তরিকতার সাথে পালনের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের উত্তম বাবা-মা হিসেবে কবুল করে নেন, সেই দুআ করতে হবে।

একটি সম্পূর্ণ নতুন দৈহিক অভিজ্ঞতা

গর্ভাবস্থা হলো এমন একটি অভিজ্ঞতা—যার প্রভাব সম্পূর্ণ দেহের ওপরে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে দৈহিক গঠনের তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলেও গর্ভকালীন কিছু উপসর্গের উপস্থিতি অনেক সন্তানসম্ভবা নারীই টের পেয়ে থাকেন। আর ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ এবং সারা দিন ঘুমের আবেশ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে—আমাদের শরীর তার গতানুগতিক অবস্থায় নেই। গর্ভাকালীন সময়ে আপনাকে স্বাগত!

গর্ভকালীন প্রথম তিন মাসের দৈহিক পরিবর্তনে আমরা অনেকেই অস্থিরতা বোধ করি। এই অস্থিরতার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমাদের আমল আর ইবাদাতে। অসুস্থতার কারণে ফরয সালাতের পর ঠিকভাবে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করা যায় না। তিলাওয়াত করলেও তাতে ঠিকভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় না। সালাতে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কিংবা রুকুতে যাওয়ার জন্য স্থান পরিবর্তনের সময় মাথা ঝিমঝিম করে। সাজদায় থাকা অবস্থায় বমি বমি ভাব হয়। অন্যদিকে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘুমানোর ফলে মাঝে মাঝে সালাতের উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ওপরন্তু কাজের সক্রিয়তা বেশ কম থাকায় সবকিছু শেষ করতেও অনেকটা সময় লেগে যায়।

দৈনন্দিন জীবনের এই পরিবর্তন দেখে মনে হতে পারে যে, আমরা সময় নষ্ট বা আলসেমি করছি। প্রাপ্তির খাতাও শূন্য মনে হতে পারে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে—এই সময়ে ঠিক এটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। আমরা গর্ভবতী;—এটা আমাদের স্বাভাবিক দৈহিক অবস্থা নয়।

আমরা পুরোপুরি সুস্থও নই। তাই এ সময়ে দেহের চাহিদাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে পারা এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দেওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। ভুলে গেলে চলবে না, এটা শুধু নিজের খেয়াল রাখার বিষয় নয়, তথাপি আমাদের ভেতর বেড়ে ওঠা একটা ছোট্ট ও নির্ভরশীল সত্তাকে আগলে রাখাও বটে।

এই সময়ে দেহের চাহিদাগুলো সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করতে হবে; বিশ্রামের প্রয়োজন হলে বসে কিংবা ঘুমিয়ে শরীরকে বিশ্রাম দিতে হবে। আর খাবারের ব্যাপারে বেছে নিতে হবে আমাদের পছন্দের খাবারটাই। কারণ, এটা হলো সুন্নাহ-সম্মত কাজ। তাই মুরগির মাংসের ঘ্রাণ যদি আমাদের অসুস্থ করে ফেলে, তাহলে সেটা না খাওয়াই উচিত এবং এই খেতে না পারা নিয়ে মন খারাপ করা যাবে না। কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ, সেটা আমাদের শরীরই ভালো বোঝে। তাই সেই অনুযায়ী চলা আমাদের কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো খাবার খারাপ বলেননি। খাবার পছন্দ হলে খেয়েছেন, আর অপছন্দ হলে কোনোকিছু না বলে সেটা রেখে দিয়েছেন।[১]

একইসাথে মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু অসুস্থ নই। সুতরাং ইবাদত-আমলের বেলায় কোনোরকম ওজর পেশ করা যাবে না। গর্ভাবস্থা আমল-ইবাদাতের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং আমল-ইবাদাত চালিয়ে যাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করার জন্য এই নয়টি মাস এক নিয়ামতস্বরূপ। কারণ, এই সময়ে আমাদের ঋতুচক্র সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। তাই কোনোভাবেই একে হেলায় নষ্ট করা যাবে না। দৈহিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার পাশাপাশি আত্মিক উন্নতি লাভের জন্য গর্ভকালীন সময় হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত। অতএব, শারীরিক পরিবর্তনের অজুহাতে সালাত পরিত্যাগের কথা চিন্তা করা বোকামি ছাড়া আর কিচ্ছু নয়!

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৫৬৩

গর্ভকালীন সময়টাতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর অপার রহমতের চাদরে আমাদের আগলে রাখেন। অনাগত সন্তানের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তাই খাবার-দাবারের বিষয়ে এই সময়ে আমরা কতই না সতর্ক থাকি! কিন্তু সব কিছুর ওপরে আমাদের এটাই মনে রাখতে হবে যে—মহান আল্লাহ-ই হলেন একমাত্র হিফাজতকারী। কাজেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং গর্ভের সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই সময়টি মহান আল্লাহকে ভুলে থাকার সময় নয়; বরং আমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে মনে রাখি, তবে নিশ্চিত থাকতে পারি যে তিনিও আমাদের মনে রাখবেন। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[১]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

সালাতে উন্নতি সাধন

গর্ভাবস্থা হলো একমাত্র সময়, যখন পুরো নয় মাস নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা ইবাদত করার সুযোগ পাই। ব্যক্তিভেদে এই বিরতিহীন ইবাদতের দুই ভিন্ন ধরনের প্রভাব সালাতে লক্ষ্য করা যায়—

* একদিকে যারা ভাবেন ঋতুচক্রের সময়টাতে তাদের ঈমান ও আমল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা খুব চমৎকারভাবে এই সময়টা কাজে লাগাতে পারেন।
* অপরদিকে, সালাত থেকে বিরতি পেলে যারা লাভবান হয়ে থাকেন, তাদের জন্য বিষয়টি দুঃখজনক। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে দাঁড়ানোর জন্য মন তৃষিত হয়ে থাকে এবং সালাতে ফেরার পর সমস্ত দেহ ও মন এক অন্যরকম সঞ্জীবনী শক্তিতে ভরে ওঠে।

প্রায় সপ্তাহখানেক অথবা বেশ কিছুদিন নিয়মিতভাবে সালাত আদায়ের পর কিছু কিছু নারী ভাবেন যে, তারা হয়তো একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করার পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছেন। এরপর ঠিক তখনই সেই 'শঙ্কিত' মুহূর্তের আবির্ভাব ঘটে। সালাতে একাগ্রতা ও আত্মতৃপ্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পুনরায় সব প্রচেষ্টা যখন ঢেলে সাজাতে হয়। ঋতুচক্র হলো নারীদের জন্য নির্ধারিত প্রাকৃতিক উপশম, যার ব্যাপ্তি সাময়িক। কিন্তু অনেকে আছেন যারা এই সময়টিতে সালাত থেকে দূরে সরে পড়েন। তাই ইবাদতের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে এবং সালাত ঠিক করতে গর্ভকালীন এই সময়টি হলো সেইসব নারীদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ।

যাহোক, নিজেদের ব্যাপারে অনেকে বলে থাকেন—ঋতুকালীন সময়ের সাময়িক বিরতিতে তারা সালাতের গুরুত্ব ও সালাতের জন্য যে টান অনুভব করেন, স্বাভাবিক সময়ে সেটা করেন না। এ-কারণে ঋতু চলাকালীন সময়েও সালাতে ফেরার জন্য তাদের মন উদগ্রীব হয়ে থাকে। একই সাথে ঋতুচক্র শেষ হওয়ার পর স্বাভাবিক সময়ের প্রথম সপ্তাহে আদায় করা সালাতে তারা অন্য সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি প্রশান্তি লাভ করে থাকেন। এই ধরনের নারীদের জন্য, গর্ভাবস্থায় সালাতে একাগ্রতা আনতে পারা কঠিন হয়ে পড়ে; কারণ, সালাতের সৌন্দর্য তাদের ইবাদতের বিরতিতে পুনরুজ্জীবিত হয় না।

সালাতের মান উন্নয়নে ও এর খুশু বৃদ্ধিতে আমরা বিভিন্নজন বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারি। খুশু অর্থ হলো বিনয়, ধৈর্য, প্রশান্তি, মর্যাদা ও নিরহঙ্কার। এটা মন ও আত্মার এমন এক পর্যায়, যখন সবকিছু একটি নির্দিষ্ট দিকে নিবদ্ধ থাকে; কিন্তু আমরা বেশিরভাগ মানুষই এই পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থ হই। তা সত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সালাতে খুশু অর্জনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

> তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও।[১]

দুঃখের বিষয় হলো—আমরা খুব কম সংখ্যক মানুষই খুশুর সাথে সালাত আদায় করতে পারি। আবার কোনো কোনো দিন হয়তো পুরোপুরি ব্যর্থ হই। এইরকম পরিস্থিতি সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন। আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৮

সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

> এমন অনেক মানুষ আছে যারা সালাত আদায় করে, কিন্তু তাদের সালাত পুরাপুরি কবুল না হওয়ায় তারা পরিপূর্ণ সাওয়াবপ্রাপ্তও হয় না; বরং তাদের কেউ ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, তিনের-একাংশ বা অর্ধাংশ সাওয়াবপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।[১]

আরও ভয়ংকরভাবেও বলা হয়েছে এই হাদিসে—'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইসলামে একজন লোকের সাদা চুল থাকতে পারে (অর্থাৎ মুসলিম অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়), অথচ সে মহান আল্লাহর জন্য একটি (বারের) সালাতও শেষ করেনি!

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—'কেন এমনটা হলো?'

উত্তরে তিনি বললেন—

> 'সে খুশু, সমতা এবং হৃদয় নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে পারে না।'[২]

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমাদের দুআ করতে হবে—আমরা যেন এই দলের অন্তর্ভুক্ত না হই। আর সেই সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়েছেন সেভাবে চাইতে হবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

> আল্লাহ, আমি আপনার কাছে এমন হৃদয়ের অধিকারী হওয়া থেকে আশ্রয় চাই—যে হৃদয় বিনীত হয় না।[৩]

---

[১] আবু দাউদ, হাদিস : ৭৯০

[২] ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাজালি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০২

[৩] জামি তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৮২

আলহামদুলিল্লাহ, অধিকাংশ নারী এটা স্বীকার করেন যে, গর্ভাবস্থায় আদায় করা সালাত অনেক শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়। এই বিষয়টি তখনই সত্যি হয় বিশেষ করে সালাতকে যখন দুআর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সহিহ মুসলিমের বর্ণনা—

> 'বান্দা তার রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সাজদায় থাকে। সুতরাং (ওই সময়) তোমরা বেশি বেশি দুআ করো।'[১]

পাশাপাশি আরও বর্ণিত হয়েছে—

> 'সাজদায় বেশি বেশি দুআ করো; কারণ, তখন দুআ কবুল হয়।'[২]

আল্লাহ তাআলার কাছে গর্ভবতী নারীদের অনেক কিছু চাওয়ার আছে আর সাজদা ব্যতীত কোথায় এই চাওয়াগুলো সঠিক মর্যাদা পাবে? তাই একটি সহজ জন্মদান ও সুস্থ সন্তানের জন্য আমরা বেশি পরিমাণে সাজদায় আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাকব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদায় যেই দুআগুলো করতেন তার মধ্যে একটি হলো:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وجِلَّهُ، وأَوَّلَهُ وآخِرَهُ
وعَلانِيَتَهُ وسِرَّهُ

> 'আল্লাহ, আমার ছোটো ও বড়ো, প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন—সব গুনাহ মাফ করে দেন।'[৩]

এই সময়ে খুব অল্প সংখ্যক গর্ভবতী নারীই তাদের সালাতের মান উন্নয়নে আগ্রহী হন এবং স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বেশি পরিমাণে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা-ই আমাদের একমাত্র ভরসার জায়গা এবং তাঁর সাহায্য ও ক্ষমা ব্যতীত সালাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি অসম্ভব। তাই আমাদের উচিত এই সময়ে যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল থাকা। আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার সময় আমরা নিম্নোক্ত ছোটো ও সহজ কিন্তু ওজনে ভারী এই দুআটি পড়তে পারি—

[১] সহিহ মুসলিম : ৪৮২
[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৭৯
[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৮২

রুকুতে থাকা অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম سمع الله لمن حمده (সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার) বলার পাশাপাশি আরও বলতেন,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

> মহামহিম অসীম পবিত্র ফেরেশতামণ্ডলি ও জিবরিলের প্রভু (আল্লাহ)।[১]

রিফাআ ইবনু রাফি আজ-জুরাকি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

> 'একদিন আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালেন, বললেন, (سمع الله لمن حمده) 'যে আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তা শোনেন।'

তখন নবীজির পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

> 'আমাদের রব, কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ অসংখ্য অগণিত প্রশংসা শুধুই আপনার জন্য।'

সালাত শেষে নবীজি জানতে চাইলেন যে, এই কথাগুলো বলেছিল কে। তখন ওই ব্যক্তিটি বলল—'আমি, ইয়া রাসুলাল্লাহ!।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'এই কথাটা কে আগে লিখতে পারে এই ভেবে ত্রিশজন ফেরেশতাকে আমি ছুটে আসতে দেখেছি।'[২]

এই দুআগুলো শিখতে এবং সালাতে পড়তে খুব বেশি কষ্ট হয় না। এগুলো খুবই সহজ, তথাপি ঈমান পুনরুজ্জীবিত করতে এসব দুআ বেশ ওজনদার ভূমিকা রাখে। অনেক কিছুর ভিড়ে এই ছোট্ট আমলগুলো আমাদের জন্য এক নিয়ামতস্বরূপ, যা প্রতিদিনকার রুটিনে আয়ত্ত করা যেতেই পারে!

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৮৭
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৯৯

রামাদান ও সিয়াম পালন

যদি একজন গর্ভবতী নারী নিজের এবং অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে শঙ্কাবোধ করেন, তাহলে রামাদানে সিয়াম পালন থেকে তিনি ইচ্ছা করলে বিরত থাকতে পারেন।[১] এ বিষয়ে প্রধান চার মাজহাবের ফকিগণ একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

দয়াময় রব তাঁর অসীম দয়া থেকে গর্ভবতী নারীদের জন্য এ-রকম সুযোগ রেখেছেন। তবে, কোনোরূপ সমস্যা তৈরি না হলে এবং বাচ্চা ও নিজের কোনোরকম ক্ষতির আশংকা না থাকলে রামাদানের সিয়াম পালন থেকে কোনোভাবেই বিরত থাকা যাবে না। তাহলে, সিয়াম রাখার ফলে অনাগত সন্তানের ওপরে আদৌ কোনো প্রভাব পড়বে কি না—তা আমরা কীভাবে বুঝব, তাই তো?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা দুটি গবেষণার ওপর চোখ বুলাতে পারি। এটি মূলত বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে এশিয়ান মুসলিম গর্ভবতী নারীদের ওপর পরিচালিত দুটি গবেষণা। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হওয়া প্রথম গবেষণাটি ১১ জন এশিয়ান মুসলিম গর্ভবতী নারীর বিপাকীয় প্রক্রিয়ার গতিবিধির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং এই পরিবর্তিত অবস্থাকে সাধারণ মায়েদের (যাদের বিপাকীয় প্রক্রিয়া স্বাভাবিক আছে) সাথে তুলনা করেছিল। গবেষকরা দেখেছেন যে, সিয়াম পালনকারী কোনো নারীর-ই অভ্যন্তরীণ জৈব রাসায়নিক মান স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তনের প্রমাণ সেখানে পাওয়া না গেলেও

[১] আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ ২৮/৫৪, আদ্দুররুর মুখতার ২/৪২২

রামাদানে গর্ভবতী নারীদের সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে সেই গবেষণায় উৎসাহিত করা হয়নি।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় গবেষণায়, ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে পূর্ণ মেয়াদে জন্মগ্রহণকারী ১৩,৩৫১ জন এশিয়ান মুসলিম বাচ্চাদের জন্মকালীন ওজন বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে শ্বেতাঙ্গ ও অমুসলিম বাচ্চাদের সাথে ওই বাচ্চাদের বয়সের তুলনা করে কোনো অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়নি। পরিশেষে গবেষকরা এই মতামতে পৌঁছান যে, মেয়াদ পূর্ণ করে জন্মগ্রহণ করা বাচ্চার ওজনে সিয়াম পালনের কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এরও পরবর্তী সময়ে ইরান, মালয়েশিয়া এবং ইয়েমেনে এই একই গবেষণা চালানো হয়েছিল এবং সেখানেও তারা একই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, রামাদানের সিয়াম পালন বাচ্চাদের ওজনে কোনো প্রভাব ফেলে না।

রামাদানে সিয়াম পালনের পূর্বে সকল গর্ভবতী মুসলিম নারীর উচিত একজন মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। আমাদের স্বাস্থ্য, গর্ভধারণের সময়কাল, সিয়ামের ব্যপ্তি এবং ব্যক্তিভেদে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে একজন চিকিৎসক এই বিষয়ে উত্তম পরামর্শ দিতে পারবেন। এছাড়াও সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও পুষ্টিগত চাহিদা পূরণের তাগিদে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

গর্ভধারণের সময়টাতে নিজেদের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং অনাগত সন্তানের কল্যাণের আশায় আমরা অনেক কিছু করতে চাই। আর, এ-সকল কাজের জন্য রামাদান আসলেই অনেক অসাধারণ একটি মাস। পবিত্রতম এই সময়টুকু অত্যন্ত সচেতন এবং উত্তম পরিকল্পনা অনুযায়ী কাটানোর কোনো বিকল্প নেই। তাই, গর্ভকালীন সময়ে যদি রামাদান মাস উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, আমাদের উচিত সেই মাসটা ঘিরে একটা সুন্দর আর সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই মাসের আমল এবং ইবাদাত যথাসম্ভব সুন্দরভাবে আদায়ের চেষ্টা করা। আত্মার পরিশুদ্ধি, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং

আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার যে সুযোগ রামাদান মাস নিয়ে আসে, তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো। এই মাসের শেষ দশদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই দশদিনকে ঘিরেও আমল আর ইবাদাতের আলাদা প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। অন্যান্য স্বাভাবিক সময়ে ঋতুচক্রের কারণে পুরো রামাদান মাসজুড়ে ইবাদাত-আমলে ডুবে থাকার সুযোগ কম থাকলেও, গর্ভকালীন সময়ে পাওয়া রামাদান তারচেয়ে একেবারেই ভিন্ন। এই মাসে আমরা পুরোটা সময়জুড়ে ইবাদতের সুযোগ পাই; তাই এ সময়ের সৎ ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তবে, অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কথা ভেবে যদি চিকিৎসক আমাদের সিয়াম না রাখার পরামর্শ দেন, তাহলে এই সুযোগকে আল্লাহ তাআলার করুণা ও নিয়ামত হিসেবে মেনে নিতে হবে। মন খারাপের কোনো কারণ নেই; গর্ভবতী নারী যদি তার এবং অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে তৈরি হওয়া শঙ্কা থেকে সিয়াম না রাখেন, তবু সিয়াম পালন করলে যে পরিমাণ সাওয়াব পেতেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অপার রহমতে একই পরিমাণ সাওয়াব তারা ঠিক ঠিক পেয়ে যাবেন। তবে হ্যাঁ, গর্ভকালীন সময়ের পরে যখন সুস্থ হয়ে উঠব, আমাদের কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই রাখতে না পারা সিয়ামগুলো, অর্থাৎ যে সিয়ামগুলো আমরা রামাদান মাসে 'কারণবশত' ছেড়ে দিয়েছি, বছরের অন্য যেকোনো সময়ে সেগুলো আদায় করে নিতে হবে। বিষয়টা মোটেও ভুলে যাওয়া চলবে না।

গর্ভবতী সিয়াম পালনকারী নারীদের 'অসুস্থতা' বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। সিয়াম পালনকালে যদি মুখভর্তি বমি চলে আসে তাহলে ওজু ভেঙে যাবে। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না। ইচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর আঙুল প্রবেশ করিয়ে বমি করা হলে সেক্ষেত্রেও সিয়াম ভঙ্গ হবে।[১] তবে গর্ভকালীন অন্যান্য অসুস্থতার দরুন সিয়াম ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেও তার জন্য কোনো কাফফারা প্রযোজ্য হবে না।

[১] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং ৭২০, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৯

রামাদান মাস নিয়ে আলোচনার এই চূড়ান্ত পর্যায়ে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আর সেটি হলো রক্তদান। প্রসব-পূর্ববর্তী সময়ে বারংবার রক্ত পরীক্ষা করা, দেহে আয়রনের ঘাটতি আছে কি না তা নির্ণয় করার জন্য হিমোগ্লোবিনের মাত্রা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাগুলোর জন্যে শরীর থেকে রক্ত নেওয়া হয়[১] এবং শরীরে আয়রনের ঘাটতি পাওয়া গেলে রক্ত নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। ঘাবড়াবেন না। রক্ত দিলে কিংবা রক্ত নিলে কিন্তু সিয়াম ভঙ্গ হয় না। সিয়াম রেখেই রক্ত দেওয়া কিংবা নেওয়া যায়।[২]

গর্ভকালীন সময়ে যেভাবে আমল-ইবাদাত করার পরিকল্পনা করি অনেকসময় সেভাবে করা হয়ে ওঠে না। হয়তো সালাতে মনোযোগ ধরে রাখা যাচ্ছে না, অথবা অধিক সময় দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না জায়নামাজে। আবার হয়তো সিয়াম পালনে অনিয়ম ভর করে এবং স্বাভাবিকের তুলনায় ঘুমটাও বেশি হয়। আবারও বলছি, এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিজের শরীরকে প্রাধান্য দেওয়া এবং শরীর যা চায় তা-ই করা। ফলে, কাঙ্ক্ষিত মাত্রার আমল ইবাদাত করা না গেলে একদম মন খারাপ করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন আমাদের অন্তরের খবর। আমরা কতটুকু করতে পেরেছি এবং সামর্থ্য থাকলে কতটুকু করতে পারতাম সে বিষয়ে আমাদের রব অবশ্যই ওয়াকিবহাল। আমাদের অন্তরের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তিনি আমাদের সে মোতাবেক পুরস্কৃত করবেন। নিচের হাদিসগুলো এই অবস্থায় আমাদের আশার বাণী শোনাতে পারে।

আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় কিংবা সফর করে, তখন তার জন্য তা-ই লিখিত হয়, যা সে আবাসে সুস্থ অবস্থায় আমল করত।[৩]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৩৮-১৯৪০, আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৬-৪৭৭, আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ ২৮/৬৯

[২] আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৬-৪৭৭, আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ ২৮/২৯-৩০

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৯৯৬

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আমার উভয় কাঁধ স্পর্শ করে বললেন—

। 'দুনিয়াতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর মতো থাকবে।'

এ-জন্য ইবনু উমার লোকদের বলতেন—

> 'সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরের দেখা পেলে অপেক্ষা করো না সন্ধ্যার। সুস্থ অবস্থায় অসুস্থতার কথা ভেবে সঞ্চয় জমা করো। আর জীবিত থাকতেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখো মৃত্যুর।'[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪১৬

হজ-উমরা

গর্ভাবস্থা আমাদের জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণ যখন আমরা অনেকেই উত্তম মানুষ ও উত্তম মুসলিমা হওয়ার জন্য মন থেকে দুআ করি। কারণ, এই সময়টায় আমরা একজন মা হয়ে ওঠার যাত্রা আরম্ভ করি। গর্ভকালীন সময়ে নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং রবের অধিক সান্নিধ্য লাভের তাগাদা যদি প্রবল হয়ে ওঠে মনে, তাহলে সুযোগ থাকলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ঘর, পবিত্র কাবাঘর পরিদর্শনে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পবিত্র থাকার যে অনুভূতি, তার সাথে পবিত্র কাবার মহিমা এবং আর-রহমানের অতিথি হিসেবে তার আশপাশে থাকার নিয়ামত আমাদের আত্মশুদ্ধির এক সুনির্মল পথে নিয়ে যায়। আমাদের শরীরে বেড়ে ওঠা নতুন সত্তাটিও যেহেতু নিষ্পাপ, ফলে এই সময়টাতে আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফের মাধ্যমে মাতৃত্ব শুরু করা সুন্দর একটা সুযোগ বটে! আর, আমরা তো জানি হজ এবং উমরার কী দুর্দান্ত ফজিলত!

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> 'একটি উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মাঝখানের গুনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ এবং ত্রুটিমুক্ত (অথবা আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।'[১]

যদিও গর্ভাবস্থার সময়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ঘর পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য খুবই চমৎকার একটা সময়, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৭৭৩

পূর্বে কিছু জিনিস মাথায় রাখা জরুরি। হজ একটি আধ্যাত্মিক, মানসিক, ও শারীরিক সফর—যা প্রচুর সংখ্যক মানুষের সাথে দলবদ্ধভাবে করা হয়। তাই পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় বা গর্ভকালীন সময়ের প্রথম দিকে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় হজের সফর করা একদমই উপযুক্ত নয়। এমনকি গর্ভকালীন সময়টাতে যদি আমরা কোনোরকম শারীরিক অসুস্থতা অনুভব না-ও করি, তথাপি এই সময়টায় হজ বা উমরাহ করতে যাওয়ার ব্যাপারে বারংবার ভাবা উচিত এবং সতর্ক থাকা উচিত। বাড়িতে থাকা অবস্থায় যে সকল চিকিৎসাসেবা সহজে পাওয়া সম্ভব, সফরকালীন সময়ে সেটা সহজলভ্য না-ও হতে পারে। বাড়তি সতর্কতার লক্ষ্যে কিছু কিছু দেশ, যেমন মালয়েশিয়া, গর্ভবতী নারীদের হজ পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

তাই গর্ভকালীন সময়ে হজ কিংবা উমরাহ সফরের বিষয়ে চিকিৎসকের সাথে নিজের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করে নিলেই ভালো। এতে উত্তম পরামর্শ গ্রহণে সুবিধে হবে।

আবেগ সংক্রান্ত পরিবর্তন

গর্ভবতী নারীরা মানসিকভাবে খুবই নাজুক অবস্থায় থাকেন। এই সময়ে আমাদের মেজাজে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ফুটে ওঠে। অনেক নারী আছেন যারা অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতা অনুভব করেন; এক সময় হয়তো তারা খুব রেগে যান, আবার পরক্ষণেই রাগ কমে গিয়ে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। আসলে এই সময়ে এমনটা হওয়া খুব স্বাভাবিক। একজন সন্তানসম্ভাবা নারীর প্রজেস্টেরন হরমোন পূর্বের তুলনায় দশ গুণ বেড়ে যায়। আবার স্বাভাবিক নারীরা তিন বছরে যে পরিমাণ ইস্ট্রোজেন হরমোন উৎপাদন করে, সেই একই পরিমাণের জন্য গর্ভবতী নারীদের সময় ব্যয় হয় মোটে একদিন! আমাদের দেহে হরমোন উৎপাদন কম-বেশি হয় মূলত মেজাজ পরিবর্তনের কারণে। তাই বিষয়টা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যাহোক, আবেগ-অনুভূতি কিন্তু পুরোপুরি হরমোনের ওপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ হিসেবে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যেকোনো পরিস্থিতিকে বিচার-বুদ্ধি ও নিজস্ব বোধ দ্বারা সামলাতে পারা একজন মানুষের জন্মগত স্বকীয়তা। কাজেই একজন মুসলিম নারী হিসেবে, বিশেষ করে গর্ভবতী মুসলিম নারী হিসেবে আবেগের মাত্রা ঠিক রাখা ও সঠিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

মুসলিমদের জন্য আবেগ কোনো অযৌক্তিক ও অনিয়ন্ত্রিত মানবিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এটি একটি প্রাকৃতিক গুণাবলি। ইসলামে আত্মনিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই মুসলিম হিসেবে অনিয়ন্ত্রিত আবেগের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। কোনোভাবেই একে সফল হতে দেওয়া যাবে না। সব সময় একটি উত্তম আখলাক নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। গর্ভকালীন সময়ে তো অবশ্যই! ইসলামে উত্তম

আখলাক ও মূল্যবোধের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যাদের চরিত্র উত্তম।' [১]

একজন ভবিষ্যৎ মা হিসেবে, কেবল উত্তম আখলাক গঠনই মুখ্য বিষয় নয়, বরং গর্ভাবস্থায় সংঘটিত কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা যেন আমাদের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেই বিষয়েও সচেতন থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই যেমন, রাগ নিয়ন্ত্রণের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারী বলেছেন—

> 'এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুরোধ করলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমাকে উপদশে দেন।'

নবীজি উত্তরে তাকে বললেন—

> 'তুমি রাগ করো না।'

লোকটি আরও কয়েকবার একই কথা বললেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বারই বললেন—

> 'রাগ করো না।' [২]

এই হাদিসটিতে গর্ভবতী নারীদের জন্য চিন্তার খোরাক আছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অনিয়ন্ত্রিত মেজাজ গর্ভের সন্তানের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিষণ্ণতা এবং উদ্বিগ্নতাও নবজাতকের জন্য ক্ষতিকর। যে-সকল গর্ভবতী নারীর মেজাজ সর্বদা চড়া থাকে, তাদের গর্ভের সন্তানদের মাঝে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায়; যেমন—নিদ্রাহীনতা, অপরিপক্ক গতিবিধি এবং বিষণ্ণতা। চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে, গর্ভাবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত মেজাজের প্রভাব বাচ্চার ওপর পড়বেই। এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা সামান্য আগেই আলোচিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসটি সর্বোতভাবে মেনে চলতে পারি এবং করতে পারি বিশেষ কিছু

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৯
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১১৬

আমলও। এই আমল রাগ এবং মেজাজ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সহায়তা করবে, ইন শা আল্লাহ। করণীয় আমল—

বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া

কুরআন কারিমে রয়েছে—

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

'অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।'

সুলাইমান ইবনু সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বসে ছিলাম। তখন দুজন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'আমি এমন একটি দুআ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান"—আমি শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই—তবে তার রাগ চলে যাবে।[১]

উত্তম আখলাকে সজ্জিত থাকা

গর্ভবতী হিসেবে আমরা হয়তো অনেক বেশি আমল-ইবাদাত করতে পারব না। অনিয়ন্ত্রিত আবেগের দরুন আমাদের সকল চেষ্টাই হয়তো ব্যর্থ হয়ে যাবে; কিন্তু তারপরও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন থেকে কোনোভাবেই বিরত হওয়া যাবে না। সাধারণত আমাদের আশেপাশে যারা থাকেন, বিশেষ করে অত্যন্ত কাছের মানুষ, তারাই আমাদের অনিয়ন্ত্রিত মেজাজের ভুক্তভাগী হয়ে থাকেন। খুব কম সময় অপর পক্ষ আমাদের মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারেন। যাহোক, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে,

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩২৮২

পরিবার, নিজের ও অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য এই বিরূপ আচরণ অত্যন্ত ভয়াবহ। ওপরন্তু, মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের প্রতি উত্তম আচরণ করা তো একজন ব্যক্তির দায়িত্ব যা অবহেলা করা একদমই অনুচিত।

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—

। তোমরা কি বলতে পার, অভাবী লোক কে?

তারা বললেন—আমাদের মাঝে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও ধন-সম্পদ নেই, সেই তো অভাবী লোক।

তখন তিনি বললেন—

> না, বরং আমার উম্মাতের মধ্যে সেই লোকই প্রকৃত অভাবী, কিয়ামতের দিন যে লোক সালাত, সাওম ও জাকাতের বিশাল সাওয়াব নিয়ে আসবে; অথচ দেখা যাবে একই সাথে সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে ও আরেকজনকে মারধর করেছে, এমন সব গুনাহও নিয়ে এসেছে। এরপর সে যাদের সাথে অন্যায় করেছে, তার আমলের সাওয়াব থেকে ওই লোকগুলোকে সাওয়াব দিয়ে দেওয়া হবে। এরপর এভাবে দিতে দিতে যদি পাওনাদারদের হক তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না যায়, তখন তাদের কাছে হয়ে থাকা ঋণের পরিবর্তে তাদের পাপের একাংশ ওই আমলকারীর ভাগে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর সাওয়াবের চেয়ে গুনাহ বেশি হয়ে যাওয়ায় একসময় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসে উত্তম আখলাক এবং মানুষের সাথে ভালো আচরণ করার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। অন্যের হক আদায়ের পাশাপাশি আমাদের ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার যে হক আছে, তা আদায়েও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৮১

'আচ্ছা, আমি তো কারও কিছু চুরি করিনি', 'আমি তো কাউকে আঘাত করিনি', কিংবা 'আমি তো কারও কোনো সম্পদ লুট করিনি'—এভাবে চিন্তা করাটা হয়তো খুবই সহজ। কিন্তু অধিক আবেগঘন এবং মেজাজের অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় জিহ্বার আগা দিয়ে কটূ কথা আর তীর্যক বাক্যে অন্যকে ক্ষতবিক্ষত করা কি চুরি, আঘাত আর সম্পদ লুটের চাইতে কম ভয়াবহ? যে আঘাত দেখা যায় তারচেয়ে যে আঘাত দেখা যায় না—সেটা অনেকসময় বেশি গুরুতর হয়। তীর্যক বাক্যবাণে মানুষের মন ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে। অন্তরে রক্তক্ষরণ হয়। তাই কথা বলার সময় আমাদের উচিত সুন্দর শব্দ নির্বাচন করে কথা বলা। জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুটি হাদিস থেকে। তিনি বলেছেন—

> 'মুমিন কখনো নিন্দাকারী, অভিশম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও অসভ্য হয় না।' [১]

তিনি আরও বলেছেন—

> 'প্রকৃত মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।'[২]

একজন প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি কখনো কারও নিন্দা করে না, কাউকে অভিশাপ দেয় না, কথা বলার সময় সে কখনো খারাপ শব্দ অথবা বাক্য ব্যবহার করে না। তার হাত এবং জিহ্বা থেকে অন্য সকলে সর্বদা নিরাপদ থাকবে। আজকাল আমাদের সমাজে পান থেকে চুন খসতে দেরি, কিন্তু একে অন্যকে গালাগাল করা, একে অন্যের ওপর চড়াও হতে কেউ দেরি করে না। এগুলো কোনোভাবেই প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নয়।

গর্ভাবস্থায় আমরা যেহেতু অত্যন্ত সংবেদনশীল একটা অবস্থার ভেতর দিয়ে যাই, এই সময়টাতে আমরা কতটুকু নিজেদের রাগ আর মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি সেটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে

[১] জামি তিরমিজি, হাদিস : ১৯৭৭
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০

একটা পরীক্ষা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কথাবার্তায় বিনীত ও কোমল হতে বলেছেন। এমনকি যারা আঘাতমূলক ও অপমানজনক আচরণ করে তাদের প্রতিও।[১]

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অনিয়ন্ত্রিত আবেগের সময় বেশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠি, কান্নায় ভেঙে পড়ি। কারও কারও চোখ খুব সহজেই সজল হয়ে ওঠে। অতি অল্পতে কাঁদতে পারা কিংবা চোখের পানি ফেলতে পারা কিন্তু মোটেও মন্দ কিছু নয়; বরং চোখের পানির মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে নিজেকে সমর্পণ করার দারুন একটা ঘটনা হতে পারে এমন মুহূর্তগুলো। এটি হয়ে উঠতে পারে মহান রবের ক্ষমা লাভের এক অনন্য মাধ্যম।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু। দয়া আর ভালোবাসার দরুন খুব অল্পতেই সজল হয়ে উঠত তার চোখ। নবীজির কন্যা জাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহার এক শিশুপুত্র মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলে জাইনাব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে পাঠান। নবীজি তার ঘরে আসার পর শিশুপুত্রকে নবীজির কোলে দেওয়া হয়। মৃত্যুপথযাত্রী সেই শিশুর করুণ চেহারা দেখামাত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু ঝরতে থাকে। এটাই তো সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির করুণা। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত এবং এই রহমত আল্লাহই বান্দার অন্তরে সৃষ্টি করে দেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। জান্নাতের আটটি দরজার যে-কোনো দরোজা দিয়ে প্রবেশের সুসংবাদ তিনি দুনিয়াতেই লাভ করেছেন। আল্লাহর রাসুলের এই মহান সাহাবি পরিচিত ছিলেন সর্বাধিক অশ্রু-বিসর্জনকারী হিসেবে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ পিতা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেছেন—

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫৯৯

> 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। চোখের পানি তিনি কখনোই আটকাতে পারতেন না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন—

> 'আবু বকরকে সালাতের ইমামতি করতে বলো।'

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—

> 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আবু বকর অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির। ইমামতি করার জন্য তিনি যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন (তার অতিরিক্ত কান্নার কারণে), লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।'[১]

কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া এবং অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে অশ্রু ঝরাতে পারা—মহান রবের এ এক অপার করুণা। সুতরাং, আমরা যখন অত্যধিক আবেগপ্রবণ হয়ে উঠব, তখন আমাদের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে বেশি বেশি স্মরণ করা। আশা করতে পারি, এর মাধ্যমে আমরা ওই দলের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব—যারা বিচার দিবসে রহমানের আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে। আর সেদিন তো আল্লাহ তাআলার আরশ ছাড়া অন্য কোনো ছায়াই কোথাও থাকবে না। যারা একাকী থাকা অবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্মরণ করেন ও অশ্রু ঝরান, শেষ বিচারের দিন তারা আল্লাহর আরশের ছায়ায় দাঁড়ানোর সম্মান ও রহমত লাভে ধন্য হবেন। সেদিন সূর্য থাকবে মাথার ওপরে এবং মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে ঘামের-সাগরে। বিচার দিবসের এই ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে এবং আল্লাহ তাআলার রহমত পেতে আমরা কিছু আমল নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে পারি—

* সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে স্মরণ করা, তার জিকির করতে থাকা।

---

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৬৪

* তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া নিয়ে ভাবতে থাকা, কুরআন কারিমের আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা, কুরআন কারিমে বর্ণিত জান্নাত এবং জাহান্নামের বিবরণ নিয়ে চিন্তা করা।
* নিজের আমলনামার দিকে দৃষ্টি দেওয়া।
* গুনাহ মাফের জন্য সর্বদা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া। অতি ক্ষমাশীল আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের কঠিন হৃদয় নরম করে দেন, তাঁর দেখানো পথে চলতে সাহায্য করেন এবং তাঁর জিকির ও স্মরণে কাঁদার তাউফিক দান করেন, নিজেদের চরিত্র উত্তমভাবে গঠনের তাউফিক দান করেন।

উত্তম আখলাক লাভের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআটি করতেন—

اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ

> আল্লাহ, আমাকে ভালো চরিত্রের পথ দেখান, আপনি ছাড়া আর কেউ ভালো চরিত্রের পথ দেখাতে পারে না।'[১]

গর্ভাবস্থায় নেতিবাচক চরিত্রের সকল দিক থেকে নিজেদের হিফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে এবং একটি উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য সব সময় দুআ করতে হবে।

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭৭১

ধৈর্যধারণ

কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

> সময়ের শপথ! মানুষ নিঃসন্দেহে ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে। তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[১]

গর্ভাবস্থার পুরো যাত্রাটাই যেন ধৈর্য শক্তি বাড়ানোর এক অনুপম সুযোগ। এই সময়টাতে আমরা নিজেরা যেমন নিজেদের ধৈর্যধারণের ব্যাপারে উৎসাহিত করি, একইভাবে আমাদের আপনজনেরাও আমাদের এই সময়টাতে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। আমরা জানি—এই কঠিন মুহূর্তগুলো দ্রুতই শেষ হবে। ভোরবেলার অসুস্থতায়, হজমশক্তির সমস্যায়, পাশ পরিবর্তনের জন্য প্রত্যেকবার বিছানা ছেড়ে ওঠায় এবং অনাগত সন্তানকে কোলে পাওয়ার আশায় ধৈর্যধারণ করা মাতৃত্বকালীন সময়ের একটি স্বাভাবিক চিত্র।

প্রত্যেক নারীই মনে করেন—অন্যদের তুলনায় তিনি হয়তো গর্ভাবস্থার সকল অস্বস্তি ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে পারেন। তুলনা করলে দেখা যায়, গর্ভকালীন সময়ের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের ব্যাপারে সকল নারীই সমানভাবে ধৈর্যশীল থাকেন। তবে আলহামদুলিল্লাহ, একজন

---

[১] সূরা আসর, আয়াত : ১-৩

মুসলিম গর্ভবতী নারী হিসেবে এটা আমাদের জন্য একটি স্বস্তির বিষয় যে, ব্যথা-যন্ত্রণা ও অস্বস্তি যা-ই হোক না কেন, সেটা যদি কাঁটা ফোটার মতো ছোটো বিষয়ও হয়, তা আসলে ছদ্মবেশে আল্লাহর রহমত; যা আমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—কোনো মুসলিমের ওপর যখন কোনো রোগ-ব্যাধি, বিপদ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কিংবা কষ্ট আর পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি সেই ব্যক্তির শরীরে যদি কোনো কাটাও বিঁধে, তার বদলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।[১]

একজন সুস্থ মুসলিমের দেহে যদি কোনো কাঁটা বিদ্ধ হয় এবং এই কাঁটার আঘাতে তার যে কষ্ট হয়, ওই কষ্টের বিপরীতেও যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার গুনাহ মাফ করার ঘোষণা দেন, তাহলে গর্ভাবস্থায় আমাদের যাবতীয় অসুস্থতা এবং অস্বস্তি, আমাদের সকল পেরেশানি এবং দুঃশ্চিন্তার বদলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কত কত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন—একবার ভাবেন তো!

আরও চমৎকার ব্যাপার কী জানেন, যে ভালো কাজ আর আমল-ইবাদাত আমরা সুস্থ থাকলে করতে পারতাম, কিন্তু গর্ভাবস্থার অসুস্থতা আর ক্লান্তিবোধের কারণে সেগুলো এখন আর করতে পারি না, সেই 'করতে না পারা' কাজের সাওয়াবগুলোও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের আমলনামায় দিয়ে দেবেন, ইন শা আল্লাহ! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'বান্দা যখন রোগাক্রান্ত হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লিখিত হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় করত।'[২]

গর্ভধারণের আগে হয়তো আমরা নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতাম, কিন্তু এখন পারছি না। হতে পারে, গর্ভধারণের আগে নিয়ম করে সোম আর বৃহস্পতিবারের সিয়াম রাখতাম, আইয়্যামে বীজের সিয়াম রাখতাম, কিন্তু এখন রাখা সম্ভব হচ্ছে না, আমাদের এই অপারগতার কারণ আল্লাহ

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৬৪১
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৯৯৬

সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে অজানা নয়। তিনি আলিমুল গায়িব। তাই তিনি দয়া করে আমাদের আমলনামায় সে-সব তাহাজ্জুদ আদায় ও সিয়াম পালনের সাওয়াব যুক্ত করে দেন। তিনি যেহেতু অন্তরের খবরও জানেন, তাই তিনি জানেন যে—সুস্থ থাকলে আমরা ঠিক ঠিক আমলগুলো করে নিতাম। আমাদের অন্তরের এই অবস্থাটুকুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে যথেষ্ট।

দুনিয়ার জীবনে নানাবিধ পরীক্ষা, দুঃখ-ক্লেদ আর বিপদ-আপদ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের পরীক্ষা করে থাকেন। এ-সবের মাধ্যমে তিনি মূলত আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেন। এই পরীক্ষায় বিজয়ীদের তিনি অঢেল পুরস্কারে ভূষিতও করেন। কুরআন কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

তোমাদের ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি (এ-সবের) কোনোকিছুর দ্বারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করব। ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দেন, যাদের ওপর কোনো বিপদ এলে হলে তারা বলে—'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' এদের ওপর তাদের রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী।[১]

[১] সূরা আল-বাকারাহ ২ : ১৫৫-১৫৭

গর্ভাবস্থায় নিশ্চয় আমাদের অনেক ভয়, অনেক বিপদ-আপদ গ্রাস করে। শারীরিক অসুস্থতাগুলো অনেকসময় সহ্যসীমার বাইরেও চলে যায়। বিপদ এবং কষ্টের এই মুহূর্তগুলোতে যদি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে তাওয়াক্কুল করে ধৈর্যধারণ করি এবং বেশি বেশি বলি 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন', তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের উত্তমরূপে পুরস্কৃত করবেন ইন শা আল্লাহ। ধৈর্যের বিপরীতে এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওয়াদা।

বিপদে আল্লাহর ওপরে তাওয়াক্কুল করে ধৈর্যধারণ করলে এবং কেবল আল্লাহর কাছেই উত্তম বিনিময় প্রত্যাশী হলে কী চমৎকারভাবে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দাকে পুরস্কৃত করেন তার একটা অনন্য উদাহরণ পাওয়া যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনে। নবীজির সাথে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার তখনো বিয়ে হয়নি। তিনি তখন অন্য একজন সাহাবির স্ত্রী। রাসুলের স্ত্রী হওয়ার আগেই উম্মু সালামা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে একটা হাদিস শোনেন। হাদিসটি হলো এই—'যখন কোনো মুসলিম বিপদে পড়ে, তখন যদি সে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে এবং এই দুআ পাঠ করে—'আল্লাহ, আপনি আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণের সাওয়াব দান করেন এবং (আমার থেকে যা চলে যাচ্ছে তার) তার চেয়ে ভালো শূন্যতাপূরণকারী দান করেন', তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ভালো শূন্যতাপূরণকারী দিয়ে ধন্য করবেন।'

উম্মু সালামা বলেন—

> 'এরপর যখন আবু সালামা ইনতিকাল করেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কোন মুসলিম আবু সালামাহ থেকে উত্তম? তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছেছেন। তারপরও আমি এ দুআ পাঠ

> করলাম। এরপর মহান আল্লাহ আবু সালামার স্থলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো স্বামী দান করেছেন![১]

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ওপর আপতিত বিপদের সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে তাওয়াক্কুল করেছেন এবং ধৈর্য ধরেছেন। আল্লাহর রাসুলের শিখিয়ে দেওয়া আমল করেছেন উত্তম বিনিময় লাভের আশায়। উত্তম বিনিময় হিসেবে তিনি জীবনে পেয়েছেন জগতে পদচিহ্ন রাখা শ্রেষ্ঠ মানুষটিকেই! তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন শ্রেষ্ঠতম রাসুলের স্ত্রী হওয়ার! সুবহানআল্লাহি ওয়া বিহামদিহি!

গর্ভাবস্থার সময়টাতে আমরাও ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করব। এই সময়ের ব্যথা, যন্ত্রণা, যাবতীয় খারাপ লাগাকে উত্তম বদলা-প্রাপ্তির আশায় সহ্য করে যাব। সর্বদা মুখে জিইয়ে রাখব আল্লাহর জিকির, নবীজির জন্য দরুদ আর নিজের জন্য দুআ। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো অত সর্বোচ্চ মর্যাদার কিছু হয়তো আমরা পাব না, কিন্তু আমাদের গর্ভের যে সন্তান, হতে পারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অপার দয়া আর রহমতে সে এমন জীবনের অধিকারী হবে—যার দ্বারা দুনিয়ার মানুষের উপকার হবে। আল্লাহর দ্বীনের উপকার হবে। হতে পারে সে এমন মুত্তাকি বান্দা হিসেবে বেড়ে উঠবে যার উসিলায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আখিরাতে আমাদের নাজাত দান করবেন। আমাদের সমস্ত গুনাহ তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'মুমিনের অবস্থা ভারি অদ্ভুত! জীবনের সমস্ত কিছুই তার জন্য কল্যাণের। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এই কল্যাণ লাভ করতে পারে না। সে আনন্দিত হলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং এটা তার জন্য আরও কল্যাণ বয়ে আনে। যদি দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে এবং সেটাও তার জন্য কল্যাণের হয়।[২]

---

[১] সহিহ মুসলমি, হাদিস : ৯১৮

[২] সহিহ মুসলমি,হাদিস : ৭২২৯

জীবনে দুঃখ অথবা সুখ যা-ই আসুক না কেন, সেটা মুমিন ব্যক্তির জন্য আদতে কল্যাণ বয়ে আনে। তাই, আমাদের উচিত গর্ভাবস্থার সময়টা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে পার করা। আল্লাহর কাছে উত্তম বিনিময়ের দুআ করা এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা।

শুকরিয়া জানানো

আমাদের জীবনে যা কিছু আছে, সব কিছুর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে শুকরিয়া জানানোর যতগুলো উত্তম সময় আছে তার একটি হলো গর্ভকালীন সময়। স্বাভাবিক সময়ে যে-সব নিয়ামত আমরা নিশ্চিন্তে ভোগ করে থাকি তার সবকিছুই আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে পাওয়া একেকটি রহমত। ওই মুহূর্তে আমরা হয়তো ব্যাপারটা সেভাবে উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া নিয়ামতের যদি তালিকা করা হয়, তাহলে তা গুনে শেষ করা যাবে না। তবে গর্ভাকালীন সময়ে আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি নিয়ামত আমরা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। তাই এই সময়টা আমরা বেছে নিতে পারি নিজেদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে; কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিয়ামত) বৃদ্ধি করে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও (তবে জেনে রাখো, অকৃতজ্ঞদের জন্য) আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।[১]

[১] সূরা ইবরাহিম ১৪ : ৭

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত দয়াময় রব যে, তিনি নিজের অনুগ্রহে আমাদের তাঁর নিয়ামতরাজির মাঝে ডুবিয়ে রেখেছেন। তারপরও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সেসব নিয়ামতরাজি পাওয়ার পরে যখন আমরা কৃতজ্ঞ হই, তখন সেসব নিয়ামত তিনি আরও বাড়িয়ে দেন। দুনিয়াতে কত মানুষ কত ধরনের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের বড়ো কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি করেননি। কত মানুষের ঘরে পরের বেলা রান্না করার মতো চাল নেই; কিন্তু আমাদের তিনি কত আরাম-আয়েশে রেখেছেন। কত মানুষের জীবন কেটে যাচ্ছে হাসপাতালের বিছানায় কাতরাতে কাতরাতে; কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, কত সুস্থ-স্বাভাবিক আমরা। কারও ঘরে শান্তি নেই, দাম্পত্য-জীবনে সুখ নেই, কোলজুড়ে সন্তান নেই; কিন্তু আল্লাহর অপার দয়া আর রহমতে আমাদের অনেকের জীবনে হয়তো সেই দুঃখগুলোর আঁচড় লাগেনি। আল্লাহর রহমতে আমাদের জীবনের এই যে অঢেল সুখ, শান্তি আর নিরাপত্তা, এসবের জন্যে কি আমরা কখনো তাঁর প্রতি সেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি? কখনো কি দুই রাকাআত অতিরিক্ত সালাত আদায় করেছি শুধু সাজদায় গিয়ে মন ভরে তাঁর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করে অশ্রু ঝরাবো বলে?

হয়তোবা করেছি, হয়তোবা করিনি। গর্ভাবস্থার সময়টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য খুবই উত্তম একটা সময়। গর্ভাবস্থায় আল্লাহর রহমত আমরা গভীরভাবে অনুভব করি এবং আমাদের মন এই সময়ে আবেগে পরিপূর্ণ থাকে। তাই এই সময়টাতে আমরা নানানভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

প্রথমত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রদত্ত নিয়ামতগুলো মনে মনে হিসেব করা। যদিও আল্লাহর নিয়ামতরাজি গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, তথাপি যতটা সম্ভব নিজের জীবনে পাওয়া আল্লাহর রহমত এবং বরকতগুলো স্মরণে আনতে পারলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুহূর্তটা আরও আনন্দময় হয়ে উঠবে। প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর একাগ্রচিত্তে আল্লাহ

তাআলার নিয়ামতের স্মরণে 'সুবহানআল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার'—এই তাসবিহগুলো পাঠ করা।

দ্বিতীয়ত, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম একটা উপায় হলো সর্বদা নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবা। দুইটি এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে আল্লাহ তাআলা 'কৃতজ্ঞ' ও 'ধৈর্যশীল' বান্দা হিসেবে তার নাম লিখে রাখবেন—

* প্রথমটি হলো—একজন ব্যক্তি দ্বীনের বিষয়ে তার থেকে এগিয়ে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে এবং তার মতো হওয়ার চেষ্টা করবে।
* দ্বিতীয়টি হলো—দুনিয়ার বিষয়ে সে তার নীচের অবস্থানে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে সকল নিয়ামতের জন্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকেদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তবে তোমাদের চেয়ে উঁচু স্তরের লোকেদের দিকে লক্ষ্য করো না। কেননা, আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা।[১]

কার কত বড়ো বাড়ি আছে, কার বাড়ির আঙিনা কত বিশাল, কার স্বামীর কাড়ি কাড়ি আয়-উপার্জন, কারা প্রতি মাসে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে যায় ইত্যাদি দেখে যদি আমরা হাপিত্যেশ করি এবং সেগুলো লাভের তাড়না অনুভব করি, দিনশেষে এই অনুভূতি আমাদের অন্তরে হাহাকার ছাড়া আর কোনোকিছুই দিতে পারবে না। এসব তাড়না আমাদের জীবনে থাকা নিয়ামতের ব্যাপারে আমাদের অসন্তুষ্ট করে তোলে। আমাদের মাথার ওপরে একটা ছাদ আছে, আমরা শারীরিকভাবে সুস্থ, আমাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আছে, আমাদের স্বামীদের ভালো একটা চাকরি আছে, আমাদের সন্তানেরা অনুগত—এই সমস্ত নিয়ামত একজীবনে কম কিছু কি? আমাদের যা-কিছু আছে শুধু ওইটুকু লাভ করাই দুনিয়ার কত কত মানুষের

[১] জামি তিরমিজি, হাদিস : ২৯৬৩

একজীবনের স্বপ্ন। আমরা যদি দুনিয়ার সম্পদ লাভে অগ্রগামী ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় নামি তা দিনশেষে হতাশা ছাড়া আর কোনোকিছুই আমাদের দিতে পারবে না। আমাদের তাকানো উচিত যাদের জীবন আমাদের চেয়ে কম স্বাচ্ছন্দ্যের, কম আরাম-আয়েশের। তাহলে আমরা নিজেদের জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারব এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারব।

কিন্তু অপরদিকে, আমাদের চারপাশে কত লোক আছেন যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন। সঠিক সময়ে আদায় করেন প্রতিদিনের সালাত। অনেকে আছেন যারা অবারিত দান-সাদাকা করেন। উত্তম আখলাক, উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য অনেক মানুষ আমাদের চারপাশে প্রশংসিত হয়। অনেকে নিয়ম করে কুরআন কারিম হিফজ করেন। কেউ কেউ ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস আত্মস্থ করার জন্য ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করেন। এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থা ঝালাই করে নেওয়া। তাদের অনুকরণ করা, তাদের মতো আমল-ইবাদাত করা, তাদের মতো উত্তম আখলাক-উত্তম চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এগিয়ে থাকা লোকজনের দিকে তাকালে নিজের অবস্থান ভেবে হৃদয়ে যে শূন্যতা তৈরি হয় সেটা আমাদের জন্য উপকারী। এই শূন্যতা আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে দূরে সরায় না, বরং আরও আর কাছাকাছি নিয়ে আসে।

তৃতীয়ত, সব সময় 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে পারা হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর রহমত উপলব্ধি করতে শেখায়। আমরা যদি প্রতিদিনকার ঘুম থেকে ওঠা, খাবার খাওয়া, কোনোকিছু লাভ করা ইত্যাদি দুআগুলোর অনুবাদ পড়ি, তাহলে দেখব—সেগুলোর অনেকটাজুড়ে আল্লাহর প্রশংসা বিদ্যমান। দুআগুলোর অর্থ অনুধাবন করে আমরা নিয়মিতভাবে সেগুলো করতে পারি। আমাদের দেখাদেখি আমাদের সন্তানেরাও দুআগুলোতে অভ্যস্ত হবে এবং তারাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ

হওয়ার রসদ খুঁজে পাবে। উদাহরণ হিসেবে কাপড় পরিধানের দুআটি দেখা যাক। নিজের কাপড় পরিধানের সময় অথবা সন্তানকে পরানোর সময় আমরা বলতে পারি—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে (কাপড়) পরালেন এবং তা আমাকে দান করেছেন আমার পক্ষ থেকে পাওয়ার কোনো শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই।[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসাবাচক এই দুআগুলোর অন্যতম কার্যকারিতা হলো এই—এসব দুআ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে আমরা কতখানি নির্ভরশীল। তাঁর দয়া, রহমত আর করুণা ছাড়া আমাদের যে কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই সেই বিষয়টি নিত্যদিনের এই দুআগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দুআগুলো নিয়মিত পাঠের চর্চা একদিকে যেমন সুন্নাহর সাথে আমাদের বন্ধন দৃঢ় করে তোলে। অন্যদিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার স্মরণে অন্তর সর্বদা ব্যাপৃত রাখার কাজও হয়ে যায়।

চতুর্থত, আমাদের উচিত সবসময় শোকড়ের কথা স্মরণ রাখা এবং এটাও মনে রাখা যে—প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের হিফাজত করছেন। আর আমাদের বর্তমান অবস্থান, অর্থাৎ আমাদের গর্ভাবস্থাও তাঁর রহমতেরই অংশ। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

[১] আবু দাউদ, হাদিস : ৪০২৩

> আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শোনার শক্তি, দেখার শক্তি আর অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পার।[১]

মাতৃগর্ভে সন্তান ধারণ মহান রবের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! একদলা মাংসপিণ্ডের মধ্যে জীবন দান, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও আবেগ সঞ্চালন করা—ব্যাপারগুলো কী ভীষণ অলৌকিক! এই অলৌকিক বিষয়গুলো কত সহজ, সাবলীল আর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে থাকে আমাদের গর্ভে—সুবহানাল্লাহ! একজন সন্তানসম্ভবা নারীর জন্য এই বিষয়টা উপলব্ধি করা অন্যদের চাইতে অনেক বেশি সহজ। তাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই বিস্ময়কর সৃষ্টি-কারুকার্যের কথা স্মরণ করে, প্রতিনিয়ত সেটা উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি। যত বেশি আমরা আল্লাহর সৃষ্টিকার্যের নিপুণতা নিয়ে চিন্তা করব, আমাদের হৃদয়-মন তত বেশি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে আসবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই যে আমাদের শেকড়, একদা আমাদেরও যে তিনি মাতৃগর্ভে এভাবে বড়ো করেছেন—সেটা আমরা ভীষণভাবে অনুভব করতে পারব।

পঞ্চমত, আমাদের সব সময় মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আমাদের চারপাশের মানুষজনের ওপর আমরা ভীষণভাবে নির্ভরশীল। আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোনের ওপর। আমাদের স্বামী-সন্তান-শ্বশুর শাশুড়ির ওপর। আমাদের পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়স্বজন—সকলে আমাদের কোনো-না-কোনো উপকারে আসেই। তাই মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা বড়ো একটা দায়িত্ব। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে লোক মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।'[২]

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৭৮
[২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ১৯৫৪

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে সম্পর্কের উন্নতি সাধন হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বাড়ে। এতে করে ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজও উপকৃত হয়। একটা সমাজের মানুষ যত বেশি একতার মাঝে থাকে, সেই সমাজ তত বেশি সুন্দর আর কল্যাণকর হয়ে ওঠে।

মোটকথা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে ওঠার জন্য আমাদের অনেক বেশি দুআ করতে হবে। দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাউফিক চাইতে হবে; যেন আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি।

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট্ট সাহাবি মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ধরে বললেন—

> 'মুআজ, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি! আর শোনো, প্রতি সালাতের শেষে এই দুআটা পড়তে কখনোই ভুলবে না—
>
> اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি জিনিসের ব্যাপারে প্রতি সালাতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলেছেন। সেগুলো হলো—

* আল্লাহকে স্মরণ করা,
* আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, এবং
* অতি-উত্তমভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারা।

কুরআন কারিমের এই আয়াতের সাথে কী সুন্দরভাবে মিলে যায় এই দুআটি—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও আর অবিশ্বাসী হয়ো না।'[১]

আমরা যদি আল্লাহকে স্মরণ করি, আল্লাহও আমাদের স্মরণ করবেন অর্থাৎ আমাদের প্রতি তাঁর খেয়াল বাড়িয়ে দেবেন। এ-জন্যেই মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে স্মরণের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য চাইতে বলেছেন। আমরা যদি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হই, তিনি তাঁর দয়া আর বরকত আমাদের জন্য আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। এ-জন্যই মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেওয়া নবীজির দ্বিতীয় উপদেশেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। উপরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—আমরা যেন অবিশ্বাসী হয়ে না পড়ি। উত্তমরূপে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করতে পারলে অন্তর কুফর আর শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করে। তাই মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য নবীজির তৃতীয় উপদেশে উত্তমভাবে ইবাদাতের কথা উঠে এসেছে।

গর্ভাবস্থা এবং গর্ভাবস্থার বাইরের স্বাভাবিক সময়ে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিখিয়ে দেওয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দুআটি আমরা প্রতি ওয়াক্তের সালাতে পড়ার অভ্যাস করতে পারি। এই দুআ আল্লাহকে স্মরণ করতে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং উত্তমভাবে তাঁর ইবাদাত করতে আমাদের জন্য সবিশেষ উপকারী হয়ে উঠবে, ইন শা আল্লাহ।

একজন গর্ভবতী নারী হিসেবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে—সন্তানধারণ নিছক কোনো ঘটনা নয়, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ রহমত। আমাদের পছন্দ করেন বলেই এই নিয়ামত ধারণের সুযোগ দিয়েছেন। চারপাশে কত কত নারী আছে যারা আকুলভাবে একজন সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা লালন করে মনে; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

ওয়া তাআলা চান না বলে তারা সেই সুযোগটা পায় না। কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

'আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন। যাকে চান তিনি কন্যা-সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন পুত্র-সন্তান। অথবা তাদের দেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।'[১]

আমাদের অনেকেই একটা সন্তান লাভের জন্য বহু বছর ধরে প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু আমাদের কোল আলো করে কোনো সন্তান আসছে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রিয় রাসুল, যাকে তিনি 'খলিল' তথা 'বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন, সেই ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তিনি বহু বছরের প্রতীক্ষার পরে সন্তান দান করেছিলেন। তার স্ত্রী সারাহ যখন ইসহাক আলাইহিস সালামকে গর্ভে ধারণ করেন, তখন তার বয়স প্রায় সত্তর। কুরআন থেকে আমরা জাকারিয়া আলাইহিস সালামের কথাও জানতে পারি, যিনি একজন সন্তানলাভের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুলভাবে দুআ করেছিলেন। বলছিলেন—

> 'আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং বার্ধক্যের কারণে সাদা হয়ে গিয়েছে আমার মাথার চুলও। আর, আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা।'[২]

নিজের অবস্থা আল্লাহর সামনে এভাবে তুলে ধরার পরে তিনি আল্লাহর কাছে একটা সন্তান লাভের আশা ব্যক্ত করেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দুআ কবুলও করেন। সুবহানাল্লাহ! এত দীর্ঘ সময় নিঃসন্তান

[১] সূরা আশ্-শূরা, আয়াত : ৪৯-৫০
[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩-৫

হয়ে থাকাটা তাদের ঈমানকে একবিন্দু তো কমাতে পারেইনি, উল্টো সেটা বহুগুণে বাড়িয়েছে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা সন্তানলাভের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত, আমাদের সামনে আল্লাহর নবী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং জাকারিয়া আলাইহিস সালামের উদাহরণ উপস্থিত আছে। এই অবস্থাকেও আমরা আল্লাহর নিয়ামত বলে গ্রহণ করব, ধৈর্য ধরব এবং অবারিতভাবে দুআ করে যাব।

কোথায় আমার কোমর-রেখা!

অনেক নারী পেট ফুলে যাওয়া (ও উরু, এবং মুখমণ্ডল...বা ভেরিকস শিরা অথবা প্রসারিত দাগ) ইত্যাদি নিয়ে আনন্দিত হয় না। সূক্ষ্ম দৈহিক পরিবর্তন কিংবা অনিয়ন্ত্রিত হরমোনের মাত্রা—এর মধ্যে কোনোটিই আমাদের জন্য বিশেষ স্বস্তির বিষয় নয়। কোথাও যেতে হলে কিংবা বাসায় কেউ বেড়াতে এলে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। কারণ, আমরা মনে করি, গর্ভাবস্থার এই পরিবর্তনের কারণে আমাদের সবিশেষ ভালো দেখাচ্ছে না। এহেন অবস্থায় আমাদের কীরূপ দেখাচ্ছে, তা জানতে স্বামীদের বারংবার প্রশ্ন করে বিরক্ত করি। মাঝে মাঝে আগের দৈহিক গঠনে ফিরে যেতে মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে। যদি আপনার কাছে ঘটনাগুলো পরিচিত মনে হয় তাহলে ধন্যবাদ। চলেন, আমরা আরেকটু ভেতরে প্রবেশ করি...

প্রিয় সহযাত্রী, গর্ভাবস্থার এমন সময়ে আমাদের একটা জিনিস খুব করে মাথায় রাখতে হবে। আমাদের শরীর এখন আর আমাদের একার নয়, বরং একটি ছোট্ট নতুন সত্তার ভাগও এখানে আছে। গর্ভধারণের আগের সময়টা আমরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কাটিয়েছি; কিন্তু গর্ভকালীন সময়েও যদি আমরা সেভাবে চলতে চাই, তাহলে তা মারাত্মক একটা ভুল চিন্তা হবে আমাদের জন্য। নিজের জন্য তো বটেই, অনাগত সন্তানের জন্যও। একসময় আমরা যেভাবে খেতাম বা ঘুমাতাম, গর্ভাবস্থায় সে-সবের কোনোকিছুই আগের মতো হবে না। মাঝে মাঝে রাজ্যের ক্লান্তি এসে আমাদের ঝাপটে ধরবে। হতাশা আর বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠবে দেহ-মন; কিন্তু বোন, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে—গর্ভধারণের আগের জীবন যেমন আমাদের জন্য নিয়ামতপূর্ণ ছিল, গর্ভধারণের পরের জীবনটাও

আমাদের জন্য নিয়ামত। আর, আমাদের দেহের অভ্যন্তরে বেড়ে ওঠা ছোট্ট সত্তাটা সেই নিয়ামতের সমান অংশীদার।

আমাদের গর্ভে তার অবস্থান অতি অল্প সময়ের জন্য। আমাদের দৈহিক পরিবর্তনও তাই ক্ষণস্থায়ী। আগের জীবনযাপনে আমরা দ্রুতই ফিরতে পারব, ইন শা আল্লাহ। শুধু গর্ভধারণের নয়টা মাস আমাদের উত্তম ধৈর্যের সাথে কাটাতে হবে এবং প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দমুখর করে তুলতে হবে। বিশ্বাস করেন, মাতৃত্ব এমন এক চমৎকার অভিজ্ঞতা যতক্ষণ না ছোট্ট সেই সত্তার আদুরে হাত আর তুলতুলে গালে আপনি চুম্বন না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাতৃত্বের প্রকৃত স্বাদ আপনি আস্বাদন করতে পারবেন না। তাকে গর্ভধারণ করা, লালন-পালন করে বড়ো করে তোলা, তার সাথে কাটানো সোনালি মুহূর্তগুলোর সাথে জীবনের কোনো স্মৃতির তুলনা হবে না। তাই আমাদেরকে একটু ধৈর্য, একটু সহনশীলতার সাথে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে সবকিছু। আমাদেরকে বুঝতে হবে—আমি কেবল আমি নই।

গর্ভাবস্থার সবচেয়ে কঠিন দিক হলো—দৈহিক পরিবর্তনের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ানো। সাধারণত বইপত্র, ম্যাগাজিন কিংবা অন্য যে-কোনো মাধ্যমে গর্ভবতী নারীদের যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তা অনেকসময় বাস্তবসম্মত নয়। অস্বাভাবিক শারীরক গঠন, ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ, বিমর্ষ চেহারা—গর্ভবতী নারীদের কথা চিন্তা করতে গেলে এসব দৃশ্যই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু আমাদের দৈহিক পরিবর্তনটা খুব ধীরে হয়। ফলে শারীরিক পরিবর্তনটাও আসে ধীরে ধীরে। আর, গর্ভাবস্থায় আপনার শারীরিক, মানসিক অবস্থা কেমন থাকবে তা অনেকটাই কিন্তু নির্ভর করে নিজের যত্ন আপনি কী রকম নিচ্ছেন তার উপরে। সুতরাং, চোখের সামনে ভাসতে থাকা গর্ভবতী নারীদের দৃশ্যগুলো ভেবে ভয় পাবেন না।

এই সময়ে যেহেতু আলাদা একটা শরীর আমাদের ভেতরে বেড়ে উঠছে, তাই আমাদের খাবার গ্রহণের স্বাভাবিক মাত্রাটা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে-সকল নারী গর্ভাবস্থাতেও খাবার-দাবারে তেমন আগ্রহী থাকে না,

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা হীনকায় স্বাস্থ্যের বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকেন। তাই ব্যাপারটাতে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। ক্ষুধা অনুভূত হওয়া মাত্রই আমাদের উচিত খাবার গ্রহণ করা। শরীর যদি বলে 'আমি ক্লান্ত' অথবা 'আমার আরও ঘুমের প্রয়োজন', তাহলে আমাদের কিন্তু তা-ই শুনতে হবে। বিশ্রাম করতে হবে অথবা ঘুমোতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে আমাদের শরীরের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে; কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমরা সর্বদা খাই খাই করব অথবা সারা দিন অলস হয়ে বিছানায় জুবথুবু হয়ে পড়ে থাকব। এটা কিন্তু সীমালঙ্ঘন। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করে না।[১] আর, অলসতা থেকে নবীজি সর্বদা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন।

গর্ভাবস্থায় আমাদের বেশ বুঝেশুনে, ভালো খাবারগুলোই খেতে হবে যেগুলো এই সময়ে আমাদের জন্য বেশি উপকারী। সর্বদা অলস হয়ে পড়ে না থেকে চেষ্টা করতে হবে বেশি বেশি সক্রিয় থাকার। বিশেষ করে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সময় অর্থাৎ ভ্রূণের বয়স যখন চার থেকে ছয় মাসে থাকে সেই সময়টায়। কারণ, এই সময়ে শারীরিক পরিবর্তন বেশ ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়।

গর্ভাবস্থা আমাদের আরও একটি বিষয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়, আর তা হলো—নিজেদের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার মাঝে তুলনামূলক গুরুত্ব বিবেচনা করা। কোনটি আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ? দেখতে সুন্দর হওয়া? নাকি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্ধারিত তাকদির মেনে ভালো অনুভব করা? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে কত চমৎকারভাবে বিষয়টা এসেছে। তিনি বলেছেন—

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ বা বাহ্যিক অবস্থা দেখেন না, তিনি বরং দেখেন তোমাদের অন্তর।'

[১] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ২৩৮০, মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ১৭১৮৬

গর্ভাবস্থা ও আমাদের পরিবর্তিত দৈহিক গঠন আমাদের একটি বিষয়ের পরীক্ষা করার সুযোগ দেয় এবং তা হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্ব বিবেচনা করা। কোনটি প্রথমে আসে? দেখতে ভালো হওয়া নাকি ভালো অনুভব করতে পারা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য যেটা ঠিক মনে করেন সেটা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া? নাকি, কেন আমাদের আগের মতো আকর্ষণীয় দেখায় না সেটা? মূলত অন্তরের অবস্থাটাই দিনশেষে একজন মুসলমানের মূল্যায়নের বিষয় হওয়া উচিত। বাহ্যিকতা কল্যাণ আনে না, কল্যাণ বয়ে আনে সফেদ আর সতেজ অন্তরের নিষ্কলুষতা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের শরীর ও বাহ্যিক আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাঁর দৃষ্টি থাকে তোমাদের অন্তরের প্রতি।'[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে বাহ্যিকতার চাইতে অন্তরের অবস্থাটাই যেহেতু বিবেচ্য, তাই আমাদেরও উচিত গর্ভাবস্থায় আমাদের শারীরিক বা বাহ্যিকতার পরিবর্তন নিয়ে খুব পেরেশানিতে না থাকা। আল্লাহর রহমতে এ-সব খুব দ্রুতই ঠিক হয়ে যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন যার জীবনের লক্ষ্য, সে কীভাবে তার বাহ্যিকতা নিয়ে মশগুল থাকতে পারে? দুনিয়াতে আরও কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আছে ভাবার মতো যেগুলোতে মনোনিবেশ করলে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভে অনেকদূর অগ্রসর হতে পারব। বারবার আয়নায় নিজের চেহারা দেখে দুঃখ পাওয়ার চাইতে সেসব কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই ঢের উত্তম নয় কি?

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৩১০

আওরাহ ও দৈহিক আবরণমোচন

গর্ভকালীন সময়ে যে পরিমাণ মানুষের কাছে আমাদের উদর (এর নীচের অংশ) উন্মোচিত হয় তা সত্যিই অবিশ্বাস্য! নিয়মিত আমাদের চিকিৎসক ও ধাত্রীর শরণাপন্ন হতে হয়। আবার আলট্রাসোনোগ্রাফি করার সময়ও সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা থাকেন। প্রসবকালে তো পুরো চিকিৎসক দলকেই উপস্থিত থাকতে হয়। এমন সময়ে যেহেতু চিকিৎসক আর ধাত্রীদের কাছে আমাদের নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে হয়, তাই খুব খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের আওরাহ, আমাদের পর্দার কোনোরকম বরখেলাপ না হয়। স্বামী ছাড়া অন্য সকলের সামনে আমাদের এই উদর অংশের 'আওরাহ' আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকতে হবে। চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজনে কোনো ধাত্রীর সামনে প্রকাশ করতে হলে সেটা ভিন্ন কথা। নিজের 'আওরাহ' উন্মোচনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা একজন মুসলিম নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই ব্যাপারটা হালকা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। নিজের 'আওরাহ'কে আচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা লজ্জার একটি অংশ। আর, লজ্জা হলো ঈমানের অংশ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আর, ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা।'[১] নবীজি আরও বলেছেন—

। 'ঈমানের ষাটটিরও বেশি শাখা আছে। লজ্জা তার একটি।'[২]

আওরাহ আবৃত রাখার ব্যাপারে কুরআনে বেশ জোরালোভাবে আদেশ এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে—

[১] ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৪১৮২
[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৯

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'(হে রাসুল) মুমিন পুরুষদের বলেন, তারা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

আর মুমিন নারীদের বলেন, যেন তারা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের

> ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীন যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [১]

একজন নারী শুধু পুরুষ থেকেই যে কেবল পর্দা করবে বা নিজের আওরাহ আবৃত করবে, তা কিন্তু নয়। অনেক সময় অনেক নারীর সামনেও অন্য নারীকে পর্দা কিংবা আওরাহ আবৃত রাখতে হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না; কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সাথে একই কাপড়ের নিচে শয়ন করবে না।[২]

প্রসবকালে আমাদের আওরাহ কতটুকু রক্ষিত থাকছে তা নিয়ে সর্বদা একটা উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হয়। প্রসবের মুহূর্তে হয়তো এই উদ্বেগ তেমন জোরালো হয় না, কিন্তু প্রসব-পরবর্তী সময়টাতে এই বিষয়টা মনে পড়তেই একটা ভয়, লজ্জা আর উদ্বেগ আমাদের অন্তরে জেঁকে বসে। একটা অনুতাপ আমাদের মন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

তবে, আমরা যদি পর্দা পালনের ক্ষেত্রে কঠোর হই, এই অনুতাপ কিংবা অনুশোচনাবোধ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। দরকার শুধু সচেতনতা, ছাড় না দেওয়ার মানসিকতা এবং যথাযথ পরিকল্পনা। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে—সন্তানের জন্মের বিষয়টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই একটা যথাযথ প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা এবং আল্লাহর কাছে অবারিত দুআই পারে

[১] সূরা আন নূর, আয়াত : ৩০-৩১
[২] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৩৮

এই অতি সংবেদনশীল মুহূর্তে আমাদের আওরাহ, আমাদের পর্দার লঙ্ঘন ব্যতিরেকে আমাদের অনাগত সন্তানকে দুনিয়ার আলো দেখাতে, ইন শা আল্লাহ।

ভাবছেন কী রকম হতে পারে সেই পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি, তাই তো? খুব সহজ। গর্ভকালীন সময়ে চিকিৎসা নেওয়ার সময় নারী চিকিৎসকের সংশ্লিষ্টতার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আমরা অগ্রিম অনুরোধ করে রাখতে পারি। আবার, আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানের ক্ষেত্রে, আবেদনের পূর্বে নারী চিকিৎসক বা ধাত্রীকে কাজটি করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। অথবা নিজেরা হাসপাতালে ফোন করে ব্যবস্থা করে নিতে পারি। নারী আলট্রাসোনোগ্রাফার না থাকার সমস্যাটি কদাচিৎ ঘটতে পারে, তবুও আমাদের ঠিকভাবে জেনে নেওয়া উচিত। যে সময়টাতে নারী চিকিৎসক থাকবেন, ওই সময়টাতে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে যেতে পারি। যদি কোনো হাসপাতালে নারী চিকিৎসক না-ই থাকেন, অন্য কোনো হাসপাতালে আমরা যেতে পারি, যেখানে নারী চিকিৎসক দ্বারা এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। আমরা আরও অনুরোধ করে রাখতে পারি, চিকিৎসক ও ধাত্রী উভয়েই যেন নারী হয়। তারা যদি মুসলিম হন তো তাহলে তা অতিশয় উত্তম। মোদ্দাকথা, আওরাহ আর পর্দা হিফাজতের বিষয়ে চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি না রাখা।

নিঃসন্দেহে, প্রসবকালীন মুহূর্তে আমরা কেবল নারীদের দ্বারাই সম্পূর্ণ সময়টায় সাহায্য নিতে চাই, যদি না প্রকৃতই সেখানে পুরুষ কর্মীর কোনো প্রয়োজন পড়ে। খুব অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে কেবল পুরুষ কর্মীর শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারটি ঘটতে পারে; এই যেমন, উপযুক্ত ও দক্ষ নারী কর্মী পাওয়া না গেলে। যদি কখনো পুরুষ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে কেবল আবশ্যকীয় অঙ্গগুলোই প্রকাশ করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, এই অনুরোধগুলো যেন পূর্ব থেকেই নিশ্চিত করে রাখা হয়। শুধু নারী কর্মীদের দ্বারা সেবা নিতে চাওয়ার অনুরোধ একজন মুসলিম বা অমুসলিম যে-কোনো গর্ভবতী নারী-ই করতে পারেন, তাই কারও নিকট এটা অদ্ভুত মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

গর্ভধারণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন বা নির্দিষ্ট কয়েকজন নারী চিকিৎসক অথবা ধাত্রীর অধীনে থাকতে পারলেই ভালো। বহু সংখ্যক চিকিৎসক বা ধাত্রী আপনাকে দেখার চাইতে, নির্দিষ্ট কয়েকজন দেখাই উত্তম।

প্রথম ত্রৈমাসিক, অর্থাৎ গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসের পর বাচ্চার হৃদস্পন্দন শোনার জন্য অধিকাংশ ধাত্রীরা ধ্বনি-তরঙ্গ যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এই ধরনের যন্ত্র ঢিলেঢালা পোশাকের নীচে স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে কামিজ (লম্বা, ঢিলা টিউনিক) খুব ভালো কাজে দেয়; কারণ, এটির উভয় পাশে ফাঁড়া থাকে এবং সাধারণত অনেক লম্বা হয়। গর্ভাবস্থা চলাকালীন অবস্থায় ভ্রূণের হৃদস্পন্দন পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ইলেকট্রনিক মনিটর তলপেটের সাথে জড়িয়ে রাখা হয়। কিন্তু পিনার্ড স্টেথোস্কোপ নামক পুরোনো ধাঁচের যন্ত্র ব্যবহার করা হলে সেক্ষেত্রে কামিজ পরিধান করা কাজে দেবে না। কারণ, এক্ষেত্রে চিকিৎসক/ ধাত্রীকে পেট বা যন্ত্রের কাছে কান পেতে হৃদস্পন্দন শুনতে হয়। তবে এই যন্ত্রের ব্যবহার বর্তমানে নেই বললেই চলে। তাই কোনো সমস্যা হবে না।

চিকিৎসকের নিকট নিয়মিত চেক-আপের সময় ও অন্যান্য হাসপাতাল-কর্মীদের আশেপাশে থাকা অবস্থায় কী ধরনের কাপড় পরিধান করা উচিত—তা একটি বিবেচনার বিষয়। রক্ত-পরীক্ষা ও রক্তচাপ নির্ণয়ের সময়ে খেয়াল রাখতে হবে পোশাকের হাতা যেন সহজে গুটিয়ে নেওয়া যায়। এমন পোশাক পরতে হবে যেন আবশ্যকীয় দৈহিক অংশ-ই কেবল প্রকাশ পায়, অন্য কোনো অংশ যেন প্রকাশিত না হয়; এবং কাজ শেষে যেন দ্রুত তা নিচে নামিয়ে ফেলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, স্তন ও তলপেট পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি পৃথক টপস এবং ঢিলা পায়জামা/স্কার্ট পরিধান করা যেতে পারে। এভাবে আমরা আবশ্যকীয় অংশের দৃশ্যমান হওয়ার পরিমাণ ও সময় নিশ্চিত করতে সক্ষম হব। তবে নিজেদের আবরু রক্ষার্থে যে-সকল বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করব এবং যত কম পরিমাণ ও কম সময়ের জন্য নিজেকে প্রকাশ করা যায় সেটাই চেষ্টা করব।

বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে, বিশেষ করে যেগুলো প্রাক-প্রসব সময়ে করা হয় সেগুলো পোশাক পরিধান করা অবস্থায়-ই করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি মোটামুটি পাতলা কাপড়ের তৈরি টপ পরে থাকি তাহলে ফান্ডালের উচ্চতা পোশাকের ওপর থেকেই নির্ণয় করা সম্ভব, এক্ষেত্রে পেট উন্মুক্ত করার প্রয়োজন নেই। গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে এই ফান্ডাল উচ্চতায় বেশ ছোটো হয় ও নীচের দিকে একদম পিউবিক বোনের উপরের দিকটায় অবস্থান করে এবং ধীরে ধীরে প্রতি সপ্তাহে এক সেন্টিমিটার করে নাভি বরাবর বাড়তে শুরু করে। এই পরিমাপটি মূলত গর্ভাবস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং জরায়ুর উপরের অংশটি কোথায় রয়েছে—তা অনুভব করার জন্য পেটে চাপ দিয়ে নির্ণয় করা হয়। যেহেতু এটি কোনো দৃশ্যমান লাইন নয়, কেবল স্পর্শ অনুভূতির মাধ্যমেই এটি শনাক্ত করা সম্ভব, তাই হালকা পোশাকের ওপর দিয়ে এই পরীক্ষাটি চালানো হয়।

অনেক নারীই এমন আছেন, বিশেষত মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা যে, তারা অন্য নারীর কাছেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে লজ্জাবোধ করেন, বিব্রত একটা ভাব নিজেরা বোধ করে থাকেন। তবে তাদের এই অস্বস্তিমূলক অনুভূতি তেমন বড়ো কোনো বিষয় নয়। কারণ, তারা কেবল আমাদের ও অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে যেটুকু করা উচিত সেটুকুই করেন। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মতামত ভেদে নারীদের চাহিদা বিষয়ে স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন হচ্ছেন। তাই কোনো নারী যদি গর্ভকালীন সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে তার আভরণ নিয়ে অধিক সচেতনতা প্রদর্শন করে থাকেন, তাহলে এটা তাদের কাছে কোনো নতুন বিষয় হওয়ার কথা নয়।

'আওরাহ' বিষয়ক আরও একটি উদ্বেগের সৃষ্টি হয় ভ্রূণের ইমেজিং নিয়ে। আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রতঙ্গ, জরায়ু ও এর আশপাশের এলাকা এবং গর্ভস্থ শিশু—এই সব কিছুই 'আওরাহ'র অন্তর্ভুক্ত। আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় যেহেতু আমাদের এসব আওরাহ

উন্মোচনের দরকার পড়ে ক্ষেত্রবিশেষে, তাই কী পরিমাণ আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা আমাদের জন্য সত্যিকার অর্থে দরকারি তা চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে ঠিক করে নিতে হবে। অনেকেই আছে প্রায় প্রতি মাসে আল্ট্রাসাউন্ড করায়। এটা নিতান্তই অদরকারি। সাধারণ গর্ভাবস্থায় সবসময় স্ক্যান করার প্রয়োজন হয় না। আর যদি স্ক্যান করতেই হয়, সেক্ষেত্রে ছবিগুলো আমরা বাসায় নিয়ে আসতে পারি এবং কেবল আমাদের স্বামীকেই দেখাতে পারি; কারণ, শুধু স্বামীর জন্যই আমাদের সবকিছু হালাল! বাকি সবার আগ্রহকে দীর্ঘ করাতে হবে নতুন অতিথি দুনিয়াতে আসার আগ অবধি।

মুসলিম নারীরা তাদের পর্দা এবং আওরাহ হিফাজতের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকবেন—এটাই স্বাভাবিক এবং চিকিৎসকদের কাছেও বিষয়টা আজকাল নতুন কিছু নয়। মুসলিম নারীদের এহেন সম্ভ্রম এবং পর্দা রক্ষা করে চলার মানসিকতা তারাও বোঝেন। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে, অনেক নারীরা 'ডাক্তার কী ভাববে'—এই চিন্তায় অস্থির হয়ে পর্দার বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে, ডাক্তারের ভাবনাকে বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে। আর এভাবে নিজের পর্দা আর আওরাহ বিসর্জন দিয়ে দেয়। পর্দা আর আওরাহ হলো মুসলিম নারীর নারীত্বের চিহ্ন যার মূল্য সর্বাধিক। এই সংবেদনশীলতাকে কোনোভাবে, কোনোকিছুর সাথে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না।

পর্দা, আব্রু, আওরাহ—এসব নারীত্বের মহান বৈশিষ্ট্য। একটু সচেতনতা, একটু গোছানো পরিকল্পনা আর অনেক বেশি দুআই পারে গর্ভাবস্থায় আমাদের পর্দা আর আওরাহ হিফাজত করতে। মহান রব আমাদের জন্য সহজ করে দেন। আমিন।

গর্ভকালীন উদ্বিগ্নতা

দুঃশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তার ভয় মানব-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুনিয়ার প্রতিটা স্বাভাবিক মানুষের বেলায়-ই তা সত্য। প্রত্যেক মানুষ কোনো-না-কোনো ভয়, দুঃশ্চিন্তা অথবা দুর্ভাবনার করাল গ্রাসে আক্রান্ত। আদতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রমের ভেতর দিয়ে।'[১]

গর্ভাবস্থায় মানসিক অবস্থার যেহেতু নিয়ত পরিবর্তন ঘটে, তাই এই সময় অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা ভরা করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নানান রকম চিন্তা আর ভাবনাতে আচ্ছন্ন থাকে মন। এত সব চিন্তা সামাল দিতে আমাদের শরীর কোনোভাবেই প্রস্তুত থাকে না।

উদ্বিগ্নতা আর দুঃশ্চিন্তা জীবনের যে-কোনো পর্যায়ে, যে-কোনো অবস্থাতে আসতে পারে। গর্ভকালীন সময়ে এই মাত্রাটা বেড়ে যাওয়াই বরং স্বাভাবিক; কারণ, এই সময়ে আমাদের দেহের অভ্যন্তরে হরমোনাল বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়। গর্ভাবস্থার উদ্বিগ্নতা যে খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়—তা আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের মা মহীয়সী মারইয়াম আলাইহাস সালামের জীবন থেকেও জানতে পারি। ঈসা আলাইহিস সালামকে গর্ভে ধারণ করে একদা তিনি বলেছিলেন—

[১] সূরা আল বালাদ ৯০ : ৪

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي
مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا

> সন্তান-প্রসবের বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষের নিচের দিকে তাড়িত করল। সে বলে উঠল—'হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম আর (মানুষের) স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যেতাম![১]

সন্তান জন্মদানের পরে যখন মানুষেরা জানবে এক কুমারী নারীর গর্ভে সন্তান এসেছে, তখন মানুষের মনে কত প্রকারের মন্দ ধারণা যে সৃষ্টি হবে তা ভেবেই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন মারইয়াম আলাইহাস সালাম। মানুষের এসব তীর্যক বাক্য সহ্য করার বদলে এর আগেই যদি তিনি দুনিয়া থেকে হারিয়ে যেতেন—এমনটাই তার প্রত্যাশা। যাহোক, আমরা জানলাম যে মহীয়সী রমণী মারইয়াম আলাইহাস সালামের মতো মানুষের মনেও দুঃশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা ভর করতে পারে। সে তুলনায় আমরা তো কোন ছার!

এই দুনিয়াতে যার তাকওয়ার পারদ যত উঁচুতে, তার জন্য আল্লাহর পরীক্ষাও তত বেশি। যেমনটা হয়েছে মারইয়াম আলাইহাস সালামের ক্ষেত্রে। সাহাবি সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার নবীজির কাছে জানতে চাইলেন—

> 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসিবতের সম্মুখীন হয় কারা?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

> 'নবীগণ। এরপর যারা ভালো মানুষ, তারা। তারপর যারা ভালো মানুষ, তারা। প্রত্যেকে তার দ্বীনদারি অনুপাতে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। যার দ্বীনদারি মজবুত, তার পরীক্ষাও তুলনামূলক কঠিন। যার দ্বীনদারি দুর্বল, তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে আসে। এভাবে বান্দা বিপদ-আপদে নিপতিত থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে

[১] সূরা মারয়াম : ১৯ : ২৩

> এমনভাবে বিচরণ করতে থাকে যে—তার ওপর আর কোনো গুনাহের দায় অবশিষ্ট থাকে না।'

সুবহানাল্লাহ! এই হাদিসটি হতে পারে আমাদের যাবতীয় দুঃশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা লাঘবের উসিলা। আমাদের ওপর আপতিত যাবতীয় বিপদ-আপদকে যদি আমরা এই হাদিসটি দিয়ে বিবেচনা করি, কোনো দুঃখ-দুর্দশাই তখন আমাদের কাবু করতে পারবে না। গর্ভাবস্থার যাবতীয় কষ্ট, অসহনীয় যন্ত্রণা, অনিঃশেষ দুঃশ্চিন্তাগুলো যদি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে ধরে নিই, এর প্রতিদানও আমাদের জন্য সে-রকম বিশাল হয়ে ধরা দেবে, ইন শা আল্লাহ।

সুতরাং, ব্যাপারটি যথেষ্ট আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, দুঃখ-দুর্দশার ভেতর দিয়েই আমরা সুখ পেতে পারি এবং একই সাথে এটি আমাদের জন্য গুনাহ মাফের উত্তম মাধ্যমও হতে পারে। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ভালোবেসে ও পছন্দ করেই এই পরিস্থিতিতে ফেলে থাকেন। মুমিন হিসেবে আল্লাহর কাছে আমাদের অবস্থান কোথায় সেটাও এসব পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা ধারণা নিতে পারি।

গর্ভাবস্থার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা সন্তানের বেড়ে ওঠার পথে তেমন প্রতিবন্ধক নয়। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের পেরিনাটাল সাইকোবায়োলোজি বিভাগের অধ্যাপক, ভিভেট গ্লোভার বলেছেন—

> 'গর্ভকালীন সময়ে আবেগের তারতম্য ঘটা খুব স্বাভাবিক বিষয়। প্রতিটা সন্তানসম্ভবা নারীই এই সময়টাতে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি চিন্তিত থাকেন।'

আলহামদুলিল্লাহ, এই সময়ের পরিবর্তিত দৈহিক ও মানসিক অবস্থাগুলোর সাথে আমরা খুব সহজে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারি।

তবে হ্যাঁ, অত্যধিক মানসিক চাপ কিংবা দুঃশ্চিন্তার ভার কিন্তু মারাত্মক সমস্যার কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে। গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসে এই ঝুঁকিটা একটু বেশিই। এমনিতে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অবসাদ স্বাস্থ্যের জন্য কখনোই ভালো নয়, তদুপরি মানসিক চাপের বহিঃপ্রকাশ যদি আমাদের

আচার-আচরণে ফুটে ওঠে, সেটা শঙ্কার বিষয় বৈকি। মানসিক চাপের ফলে অনেক নারীরা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করেন না, এবং পুষ্টিকর খাবার এড়িয়ে চলার একটা ব্যাপক প্রবণতা লক্ষ করা যায়; কিন্তু আমরা তো জানি যে, গর্ভাবস্থায় আমাদের পরিমাণ মতো খেতে হবে এবং পুষ্টিকর খাবার-দাবারই খেতে হবে।

অত্যধিক মানসিক চাপে ভোগার আরেকটা ক্ষতিকর দিক আছে। মানসিকভাবে চাপে থাকার একটি স্বতন্ত্র বায়োকেমিক্যাল প্যাটার্ন রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট কিছু হরমোন নিঃসৃত হয়। তাই মানসিক চাপে থাকাকালীন নিঃসৃত ক্যামিকেল উপাদানগুলো আমাদের সন্তানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে বলেও চিকিৎসা বিজ্ঞান দাবি করে। ২০০০ জন বাচ্চাদের ওপর একটি পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, গর্ভাবস্থায় নেওয়া চাপের কারণে তাদের জন্মকালীন ওজনে বেশ লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছিল এবং তাদের বেশির ভাগই কম ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়ার ঝুঁকিতে ছিল। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, উচ্চ মাত্রার রক্তচাপ গর্ভকালীন সময়ে প্রাক-একলেম্পসিয়ার মতো বিভিন্ন জটিল সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

দুঃশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি যেহেতু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এগুলো পাশ কাটানোর কোনো সুযোগ নেই। তবে, অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা লাঘবে ইসলামে আমাদের জন্য কিছু সমাধান বাতলে দেওয়া আছে। এই সমাধানগুলো থেকে গর্ভাবস্থা তো বটেই, জীবনের অন্যান্য যে-কোনো সময়েই আমরা উপকৃত হতে পারব, ইন শা আল্লাহ। তাহলে জেনে নেওয়া যাক, জীবন থেকে দুঃশ্চিন্তা আর উদ্বিগ্নতা কমিয়ে আনতে আমরা কী কী উপায় অবলম্বন করতে পারি—

আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া

কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তর প্রশান্ত হয়।'[১]

গর্ভাবস্থায় অধিক পরিমাণে হরমোন নিঃসরণের কারণে যারা খুব বেশি অস্থিরতা অনুভব করেন, তাদের জন্য জিকির হচ্ছে উত্তম ঔষধ। প্রশান্ত অন্তর হলো সেই সুখ, যা সকলে পেতে চায়। আর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার স্মরণ ছাড়া এটা কোথাও মিলবে না। অনাগত সন্তানের শারীরিক অবস্থা অথবা প্রসবকালীন মুহূর্তের ভাবনা যখন আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে, তখন কেবল আল্লাহর স্মরণই পারে আমাদের সেই ভয়ের কূপ থেকে উদ্ধার করতে। কুরআন কারিম তিলাওয়াতের মাধ্যমে, মুসাল্লায় সালাতে দাঁড়িয়ে অথবা আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো ধীরেসুস্থে উচ্চারণ করে আমরা মশগুল হতে পারি আল্লাহর স্মরণে। এই স্মরণ আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে—আল্লাহই পরিকল্পনা করেন এবং তাঁর পরিকল্পনাই সর্বোত্তম। তিনিই সকল প্রাণীর আশ্রয়দাতা এবং রিজিকদাতা। ক্ষুধার্ত যে পাখিটা ভোরবেলা নীড় ছেড়ে বের হয় খাবার অন্বেষণে, যে আদৌ জানে না কোন দিগন্তে গেলে সে আহার পাবে, সেই পাখিটার রিজিকের দায়িত্বভারও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর। আল্লাহর স্মরণ আমাদের আরও মনে করিয়ে দিয়ে যায় যে—তিনিই সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছার ওপর কারও ইচ্ছা চলে না। তাঁর অগোচরে ঘটে না কোনোকিছুই। আর, তিনি বান্দার জন্য যা কিছুই নির্ধারণ করেন, দিনশেষে সেটা বান্দাকে কল্যাণের পথেই ধাবিত করায়। আল্লাহকে স্মরণের মাধ্যমে এই বোধগুলো যখন আমাদের অন্তরে জাগ্রত হবে, আমাদের অন্তরে ভয়ের বদলে জন্ম নেবে আশার বুদ্বুদ। তাই গর্ভাবস্থায় যিকির তথা আল্লাহর স্মরণ হোক আমাদের নিত্যদিনের অংশ।

[১] সূরা আর রাদ, আয়াত : ২৮

বেশি বেশি দুআ করা

কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

'আর তাঁর কাছে রয়েছে অদৃশ্যের চাবি। তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা-কিছু আছে সে সম্পর্কে। আর কোনো পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং জমিনের অন্ধকারে কোনো দানা পড়ে না, না কোনো ভেজা এবং না কোনো শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।'[১]

যখন মনে হবে আপনার অন্তরের ভাষা কেউ বুঝতে পারছে না, কিংবা আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার মতো কেউ আশেপাশে নেই, মনে রাখবেন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন 'আস-সামি', 'আল-বাসির।' তিনি সবকিছু শোনেন আর সবকিছুই দেখেন। দুনিয়ার মানুষ আপনার অন্তরের ভাষা বুঝতে অপারগ হলেও, আপনার রব কিন্তু ঠিক ঠিক আপনার মনের অবস্থা বুঝে ফেলেন। যে দুঃখ আপনি কাউকে বোঝাতে পারছেন না, যে কষ্ট কারও সাথে ভাগাভাগি করতে পারছেন না, সে-সব সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

[১] সূরা আল আনআম, আয়াত : ৫৯

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

'আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যেহেতু আমি নিকটবর্তী, আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে।'[১]

ঘাড়ের শাহি রগের চেয়েও নিকটবর্তী থাকেন আপনার রব। সুতরাং আপনার দায়িত্ব হলো তাঁকে ডাকা, তাঁর কাছে চাওয়া। তাঁর কাছে চাইলেই তিনি দেন। ডাকলেই তাঁর সাড়া মেলে। এত দয়াময়, অপার অনুগ্রহ যার, তাঁর কাছে না চেয়ে, তাঁকে না ডেকে, ভুলে গিয়ে কীভাবে বান্দা অতিবাহিত করতে পারে তার দিন? গর্ভাবস্থায় যে অস্থিরতা আপনাকে শান্তি দিচ্ছে না, যে ভয় আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, যে শঙ্কা কেড়ে নিয়েছে আপনার ঘুম আর আহার, সেসব থেকে আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চান। কায়মনোবাক্যে তাঁকে ডাকেন। দুঃশ্চিন্তা থেকে বাঁচতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্য দুআ শিখিয়েছেন উম্মতকে। হিসনুল মুসলিম বই অথবা অ্যাপ থেকে সে-সব দুআ নিয়মিত পড়তে থাকেন। সকাল-সন্ধ্যার আমলগুলোতে জোর দেন। শুধু দুঃশ্চিন্তা মুক্তির জন্যই নয়, অনাগত অতিথিকে ঘিরে আপনার যা যা স্বপ্ন, সেসব স্বপ্নের কথাও আল্লাহকে জানান। যদিও তিনি জানেন, তথাপি বান্দার মুখ থেকে শুনতে কতই না পছন্দ করেন তিনি! আপনার রব হোক আপনার প্রতিটা মুহূর্তের সঙ্গী।

আখিরাত নিয়ে ভাবা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

> 'দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লে অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। শুধু তা-ই নয়, দারিদ্র্যও তাকে পেয়ে বসবে ভীষণভাবে; কিন্তু এতে লাভ হয় না কোনো। দুনিয়া নিয়ে মশগুল হয়ে কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার কেবল ততটুকুই অর্জন করতে পারে, যতটুকু তার তাকদিরে আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দেবেন। তার অন্তর করবেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাজির হবে।'[১]

গর্ভকালীন সময়ে দুনিয়ার ভাবনা আমাদের পেয়ে বসতে পারে। নানাবিধ ভয় আর আশংকা ভর করতে পারে মনে। আমাদের উচিত হবে এমন সময়ে বেশি বেশি আখিরাতকেন্দ্রিক ভাবনাতে ডুবে যাওয়া। আখিরাত নিয়ে চিন্তা করলে অন্তর নরম হয়, অস্থিরতা-মুক্ত হয় এবং আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

ভরসা কেবল আল্লাহর ওপর

একজন মুমিন প্রকৃতার্থে কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরেই ভরসা করবে। তার আশা এবং ভরসার একমাত্র কেন্দ্রস্থলের নাম—আল্লাহ। এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস যার হৃদয়ে প্রোথিত থাকে, দুনিয়ার সমস্ত বিপদ, সমস্ত মুসিবত ডিঙিয়ে যাওয়া তার জন্যে সহজ হয়ে যায়। গর্ভাবস্থার অতি নাজুক সময়ে অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুল তথা ভরসা রাখাটা আরও ভীষণভাবে জরুরি। গর্ভাবস্থা জীবন-মরণেরও একটা সন্ধিক্ষণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে অটুট তাওয়াক্কুলই পারে এমন অবস্থায় আমাদের মনোবল দৃঢ় রাখতে। তাই, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, ঈমানের পারদ উঁচুতে তুলে দেয় এমন কাজকর্মে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। হতে পারে বেশি বেশি আজকার, তিলাওয়াত, নফল সালাত এবং দুআ। কুরআন কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৪১০৫

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

'এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দান করবেন—যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।'[১]

আমরা আগেই জেনেছি যে—গর্ভাবস্থা চিন্তা এবং উদ্বিগ্নতার সময়। এই সময়ে একজন গর্ভবতী নারীর মন নানান চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকাই স্বাভাবিক। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে সেই চিন্তা এবং উদ্বিগ্নতা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। অত্যধিক চিন্তার চাপ গর্ভবতী নারী এবং অনাগত সন্তান—দুজনের স্বাস্থ্যের জন্যেই হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। যে-সকল কাজ আমাদের মন প্রফুল্ল রাখে, আমাদের মস্তিষ্ক বাড়তি চিন্তার নাগপাশ থেকে মুক্তি দেয় সেই কাজগুলো এ-সময় আমরা বেশি বেশি করতে পারি। যেমন—প্রিয় বান্ধবীর সাথে আড্ডা দেওয়া, স্বামীর সাথে কোথাও ঘুরতে যাওয়া (অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে), বাবা-মা'র কাছাকাছি থাকা, ভাই-বোনদের সাথে ছোটোবেলার স্মৃতি রোমন্থন করা ইত্যাদি।

এই ছোটো ছোটো কাজগুলোর মাধ্যমে আমাদের ভার হয়ে থাকা মন আনন্দ খুঁজে পাবে এবং আমাদের মস্তিষ্ক মুক্তি পাবে অত্যধিক চিন্তার করাল গ্রাস থেকে। মহান রব আমাদের জন্য সহজ করে দেন। আমিন।

[১] সূরা আত তালাক, আয়াত : ৩

গর্ভকালীন বিষণ্ণতা

একটা গবেষণায় দেখা গেছে, ১০ থেকে ৬০ শতাংশ নারী গর্ভকালীন সময়ে বিষণ্ণতায় ভোগেন। অনেকে গর্ভকালীন সময়ের বিষণ্ণতা নিয়ে বিভ্রান্তিতেও পড়েন। তারা বলেন—গর্ভাবস্থা তো হাসিখুশি থাকার সময়, এই সময়ে এত বিষণ্ণতা ভর করে কেন?

আসলে, গর্ভকালীন উপসর্গ আর বিষণ্ণতার উপসর্গ প্রায় কাছাকাছি হওয়াতে এ-ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয়ে থাকে। আবার, অনেক সময় দেখা যায়, গর্ভকালীন বিষণ্ণতার বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়া হয় কিংবা তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে অনেকের মনে এই ধারণা গেঁথে যায় যে—গর্ভবতী হওয়া ও বিষণ্ণ থাকা বুঝি একই ব্যাপার!

আমাদের বুঝতে হবে—গর্ভবতী হওয়া এবং বিষণ্ণ থাকা, দুটোই আলাদা বিষয়। গর্ভাবস্থার সময়ে আমরা যেমন অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা করাই, ঠিক একইভাবে বিষণ্ণতারও চিকিৎসা করানো উচিত। দৈহিক স্বাস্থ্যের মতো মানসিক স্বাস্থ্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেই কেবল আমরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসার দ্বারস্থ হই। মানসিক অসুস্থতাকে পাত্তা না দেওয়া একটা বহুল প্রচলন নারী-পুরুষ সকলের মাঝে সমানভাবে লক্ষণীয়। মানসিকভাবে সুস্থ না থাকলে সেটার প্রভাব যে আমাদের শারীরিক সুস্থতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে—এই জিনিসটা আমরা অনেক দেরিতে বুঝতে পারি।

বিষণ্ণতা, বিশেষ করে গর্ভকালীন বিষণ্ণতার ব্যাপারে আমাদের উচিত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। ভুল বুঝবেন না। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া মানেই সর্বদা একগাঁদা ওষুধ খাওয়ার ফরমায়েশ পাওয়া নয়। কিছু

পরামর্শ, কিছু নতুন চিন্তা এবং জীবনযাপনে কিছুটা পরিবর্তন আনার মাধ্যমেও অনেক বিষণ্ণতার কবল থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব এবং মানসিক স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা এদিকটাতেই বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন। তবে তারা তীব্র বিষণ্ণতায় ভোগেন, ওষুধের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া তাদের জন্য কোনো উপায় নেই। তবে বিষণ্ণতার চিকিৎসায় বর্তমানে যেসব থেরাপি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো বেশ কার্যকর। নেতিবাচক চিন্তাধারা বদলে দেওয়া এবং আচার-আচরণে সে-সবের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এসব থেরাপি এখন বহুলভাবে ব্যবহৃত।

গর্ভকালীন বিষণ্ণতাকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দায়িত্বশীল যে-কাউকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে, সেটা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করাই সবচেয়ে জরুরি কাজ। ঘরোয়াভাবে কতগুলো বিষয়াদি ঠিক করে নেওয়া গেলে অনেক সময় বিষণ্ণতার কবল থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। নিচে আমরা সে-রকম কিছু বিষয়ের দিকে সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বলতে চাইছি না যে, এই কাজগুলো করলেই বিষণ্ণতা একদম দূরীভূত হয়ে যাবে। তবে, বিষণ্ণতা কমিয়ে আনতে কাজগুলো সহায়ক হবে, ইন শা আল্লাহ। যেমন—

একজন সাহায্যকারী রাখা

বিষণ্ণতা একা আসে না, সাথে নিয়ে আসে একরাশ ক্লান্তি। গর্ভাবস্থায় এই ক্লান্তি জিনিসটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। অনেক সময় এত ক্লান্ত লাগে যে—নিজের কাজটুকু পর্যন্ত করার শক্তি পাওয়া যায় না ভেতর থেকে। এই নাজুক পরিস্থিতিগুলোর কথা ভেবে আমরা একটা কাজ করতে পারি। আমাদের কাজগুলো করে দেওয়া অথবা গুছিয়ে দেওয়ার জন্য একজন পরিচারিকা বা সাহায্যকারী রাখতে পারি। বিষয়টা অবশ্যই স্বামীর সাথে আলোচনা করে নিতে হবে। গর্ভাবস্থায় মুভমেন্ট তথা স্বাভাবিক চলাফেরা ঠিক রাখতে হয়। ঘরের কিছু কাজকর্ম, যা আমাদের গর্ভের সন্তানের কোনো ক্ষতি করবে না, সে-সব যদি আমরা নিয়মিত করে থাকি, তাহলে আমাদের শারীরিক মুভমেন্ট ঠিকঠাক থাকবে। শরীরের জন্য এটা দরকারি। কিন্তু

এমন কাজও তো থাকে—যা করতে গেলে ক্লান্তি আসে। এমন কাজের জন্য ঘরে যদি একজন পরিচারিকা রাখা যায় বা আশেপাশের কারও সাহায্য নেওয়া যায়, তাহলে উত্তম।

ব্যায়াম করা

গর্ভাবস্থা শুরু হয়েছে কিন্তু এখনো যদি কোনো ব্যায়াম করা শুরু না করেন তাহলে কিন্তু ভুল করছেন। চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে অতি-দ্রুত কিছু ব্যায়ামের তালিকা নিয়ে নেন—যা আপনার জন্যে দরকারি। গর্ভাবস্থায় হাঁটাহাঁটি করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটার বন্দোবস্ত করতে হবে। হাঁটার জন্যে বাইরে গেলে ভালো। কোনো পার্ক অথবা মনোরম জায়গা যেখানে বিশুদ্ধ বাতাস থাকবে, কোলাহল থাকবে না। তবে, যদি বাইরে যাওয়ার সুযোগ তেমন না থাকে, তাহলে ঘরের মধ্যে স্থির-সাইক্লিং কিংবা পাইলেটস পছন্দের তালিকায় রাখতে পারেন। ব্যায়ামগুলো যেহেতু ঘরেই করা যায়, তাই পর্দার সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই ধরনের ব্যায়ামে পিটে বা হাঁড়ের জয়েন্টেও চাপ পড়ার সম্ভাবনা নেই। বিষণ্ণতা বা মানসিক চাপ যে হরমোন নিঃসরণে কারণে হয়ে থাকে, সেই হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের শরীরে কিছু প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আছে। ব্যায়াম সেই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলো কাজে সহায়তা করে। ব্যায়ামের ফলেও শরীর থেকে একধরনের হরমোন নিঃসরণ ঘটে যা ঘুমোতে সাহায্য করে এবং দেহে একটা ভালো অনুভূতির আবেশ এনে দেয়। বিষণ্ণতা নিয়ন্ত্রণে এটা বেশ কার্যকরী।

পরিমিত পরিমাণে ঘুমানো

গর্ভবতী নারীর শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে যে কয়েকটা জিনিস সবচেয়ে দরকারি—পরিমিত পরিমাণে ঘুম তার মধ্যে অন্যতম। বিষণ্ণতার লক্ষণগুলো মারাত্মক পর্যায়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পর্যাপ্ত ঘুমের বিকল্প কিছু নেই। অনেক গর্ভবতী নারীরা পরিমিত পরিমাণে ঘুমোতে পারে না। এই ঘুমোতে না পারার কারণগুলো অবশ্যই খুঁজে বের

করতে হবে এবং সে-মতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঘুমোনোর সময় সন্নিকটে এলে এমনকিছু ভাববেন—যা আপনার মনকে আনন্দ এবং তৃপ্তি দেয়। সেটা হতে পারে অনাগত সন্তানকে ঘিরে আপনার রঙিন স্বপ্নগুলোর কথা, হতে পারে আপনার বিয়ের স্মৃতি কিংবা শৈশবের কোনো মধুর মুহূর্ত। অথবা—বাইতুল্লাহ সফরের যদি কোনো স্মৃতি থাকে তা-ও রোমন্থন করা যায়। মোদ্দাকথা, এমনকিছু ভাববেন—যা আপনার মনকে উদ্বেলিত করবে। এমন কিছু কখনোই ভাববেন না, যা আপনার মস্তিষ্কে চিন্তার জট পাকিয়ে দেবে। এতে আপনার ঘুমের বারোটা বাজবে।

ঘুমোনোর আগে যদি কুসুম গরম পানিতে গোসল করে নিতে পারেন তো বেশ ভালো। এটা শরীরে আরাম এবং উষ্ণতা এনে দেবে। তারপর কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা যায়। হাদিসে ঘুমোনোর আগে সূরা মুলক, আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস-নাস-ফালাক তিলাওয়াতের ব্যাপারে নির্দেশনা এসেছে। ঘুমোনোর আগে এই আমলগুলো করা যেতে পারে।

নিজেকে সময় দেবেন

প্রতিটি ব্যক্তির নিজের জন্য একান্ত একটা মুহূর্ত বরাদ্দ থাকা জরুরি। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন এমন একটা সময়কে বেছে নেবেন, যে-সময়টা একান্তই আপনার। এই সময়ে আপনি পছন্দের কাজগুলোই শুধু করবেন। একা সময় না কাটলে ঘরে অন্য বাচ্চা বা ছোটো কেউ থাকলে তাদের সাথেও সময় কাটানো যায়। ছোটোদের সংস্পর্শ মন উদ্দীপ্ত করে। তাদের আধো আধো বোল, হেলেদুলে হাঁটার ভঙ্গি মনকে অসম্ভব রকম সজীব করে তোলে।

জীবনের সন্ধিক্ষণে মৃত্যুর ভাবনা

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের ভেতর বেড়ে ওঠা নতুন এক জীবন আমাদের মৃত্যু সম্পর্কে আরও বেশি সজাগ করে তোলে! গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস সময়কালে গর্ভপাত (মিস-ক্যারেইজ) হওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে। প্রথমবার গর্ভধারণের ক্ষেত্রে এই হার শতকরা ৩০ ভাগ। প্রায় সকল গর্ভবতী নারীই ব্যাপারটা অনুভব করতে পারেন বিধায় গর্ভাবস্থায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ নিয়েও বেশ ভাবনা-চিন্তায় নিমজ্জিত থাকেন। জীবন কতটা ক্ষণস্থায়ী এবং এর ওপর আমাদের কর্তৃত্বও কত ক্ষুদ্র—এ সময়ে অনেক নারী সেটা বুঝতে সক্ষম হন।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের এই উপলব্ধি বিস্ময়করভাবে আমাদের আমল এবং ইবাদাতে প্রভাব ফেলে। কোনো খারাপ প্রভাব নয়, ভালো প্রভাব। মৃত্যুর অনিবার্যতা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অসীম ক্ষমতা এবং আমাদের অনিঃশেষ দুর্বলতা আমাদের মহান রবের আরও নিকটবর্তী হতে সহায়তা করে।

প্রতিটি মানুষের জন্য গর্ভের জীবনটুকু হলো মায়ের সঙ্গে বাঁধা একটি সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্ত। মা হলেন এমন একজন ব্যক্তি—যিনি আমাদের না দেখেই তার ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে রাখেন। আমাদের রাখেন তার প্রতিটি অনুভবে। গর্ভের সেই স্বাপ্নিক যাত্রা শেষে একদিন মানবশিশু আলিঙ্গন করে এই আলো এবং শব্দমুখর দুনিয়াকে।

একটা শিশুর জন্য গর্ভের দুনিয়া আর আমাদের দুনিয়ার মাঝে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান। শিশুদের সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের মুহূর্তগুলো কাটে কিন্তু মাতৃ-গর্ভে—এমনিওটিক ফ্লুইডে নিমজ্জিত অবস্থায়। যখন তারা নাড়ির

সাহায্যে মায়ের হৃদস্পন্দন শুনতে পায়। কী অকল্পনীয় ব্যাপার, তাই না? কিন্তু শিশুটির বেলায় যদি আমরা নিজেদের কল্পনা করি, ব্যাপারটাকে তখন কিন্তু মোটেও সুখকর মনে হবে না। একটা দমবন্ধ অবস্থা, শ্বাস নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত বাতাসের অনুপস্থিতি, সংকীর্ণ জায়গার মধ্যে সীমিত নড়াচড়া এবং শোনার মধ্যে কেবল একটি চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া—বেশ যন্ত্রণাদায়কই বটে!

পৃথিবীতে আসার জন্য, জন্মের মুহূর্তে একটি শিশু পরিবেশগত এক আমূল পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকে। শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করা, গর্ভের ছোট্ট জায়গায় আর আবদ্ধ হয়ে না থাকা, নতুন নতুন সব দৃশ্যের দেখা পাওয়া এবং প্রথমবারের মতো এক নতুন জগতে প্রবেশ—এই অনুভূতিগুলো সত্যই বিস্ময়কর, যা অন্যদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দুনিয়াতে জন্মের সময়টা যেমন সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা, মৃত্যুর সময়টাও একই। সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ, নতুন এক অবস্থা। তাই, জীবনের সন্ধিক্ষণে মৃত্যুর ভাবনা আসাটা মোটেও অমূলক নয়, বরং এটা ব্যক্তিকে বিষয়ের গভীরে গিয়ে ভাবতে সাহায্য করে।

মৃত্যু এবং আখিরাত নিয়ে আলোচনা করাটা অনেকের কাছে হতাশাজনক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সর্বদা আখিরাত এবং মৃত্যু নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কথা বলে গেছেন। যদি কোনো চিন্তা মানুষকে হতাশ করে তোলে, সেই চিন্তা কেন নবীজি আমাদের করতে বলবেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন—

> 'নিশ্চয় হৃদয়ে মরিচা ধরে, যেভাবে পানি লাগলে মরিচা ধরে লোহায়।

নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হলো—'আল্লাহর রাসুল, এই মরিচা দূর করার উপায় কী?'

তিনি বললেন—

। 'বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।'[১]

মাতৃত্বের যাত্রায় অন্তর পরিশুদ্ধ করার আদর্শ একটি উপায় হলো—অত্যধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করা। একজন মুমিন হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার ভিত্তিপ্রস্তরও এটি। গর্ভাবস্থা বা অসুস্থতার কঠিন সময়ে ঠিকমতো ইবাদাত করা হয়ে ওঠে না। তাই অনেকেই নিজেদের ঈমানের বিষয়ে ভয় করি। মনে করি—ইবাদত থেকে দূরে থাকার কারণে আমাদের ঈমান হারিয়ে যাচ্ছে। ঈমান সজীব ও সতেজ রাখার কিছু মাধ্যম আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে নিয়ে, তাঁর ভালোবাসা ও ভয়কে নিয়ে, মৃত্যুকে নিয়ে গভীর চিন্তাই পারে আমাদের অন্তর পুনরুজ্জীবিত করতে।

[১] শুআবুল ঈমান, হাদিস : ১৮৫৯, মিশকাত, হাদিস : ২১৬৮

স্তন্যপান

সদ্যোজাত শিশুকে কীভাবে খাওয়ানো হবে সে বিষয়ে গর্ভকালীন সময়ে চিন্তা করা জরুরি। ৯৪ শতাংশ গর্ভবতী নারীরা একমত যে, মায়ের দুধ সন্তানের জন্য ভালো। তবে এদের মধ্যে কেবল ৭৬ শতাংশ নারীই সন্তানকে বুকের দুধ পান করাতে সম্মত হন। মায়ের দুধকে শিশুদের জন্য একটি অনন্য, বিশেষ তৈরি খাবার ও পানীয় হিসেবে যখন প্রস্তুত করেছেন করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তখন এ-সকল নারীর অসম্মতির কারণ কী হতে পারে?

মায়ের বুকের দুধ সন্তানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী খাবার। খেয়াল করলে দেখবেন—দুনিয়ার তাবৎ বড়ো বড়ো দুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বাচ্চাদের জন্য বানানো দুধের কৌটায় লিখে দেয়—'মায়ের দুধের বিকল্প নেই।' সত্যই শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প দুনিয়াতে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অসীম দয়া আর অনুগ্রহ যে, এত চমৎকার, উপাদেয় শিশু-খাদ্যটা একজন মাকে কোথাও কিনতে যেতে হয় না। যদি মাতৃ-দুগ্ধের বিকল্প তৈরি হতো আর তা টাকা দিয়ে কিনতে হতো, কী অবস্থা হতো মানুষের?

সন্তানকে স্তন্যপানের বিষয়টি মায়েদের ওপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরজ করেছেন। সদ্যোজাত সন্তানকে মা বুকের দুধ পান করাবে—মায়ের ওপর এটা সন্তানের হক। তবে বর্তমানে দুধপান করানোকে ফরজ বিধান হিসেবে নয়, উপস্থাপন করা হয় ফ্যাশান আর চয়েজ হিসেবে। এটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্তি এবং পথ-ভ্রষ্টতা। সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া একজন মা তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করানো থেকে বিরত

থাকতে পারেন না কোনোভাবেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন কারিমে ঘোষণা করেছেন—

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য, যে (তার সন্তানের) দুধ পান করানোর সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার ওপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদের খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব কাউকে প্রদান করা হয় না। কোনো মাকে কিংবা বাবাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর ওয়ারিশের ওপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোনো পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য কারও থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদের যা দেওয়ার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং

> জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যা কর, সে-সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।[১]

মায়ের বুকের দুধ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে একটি বিস্ময়কর উপহার। মা ও সন্তান উভয়ের জন্য বুকের দুধের উপকারিতা বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। বুকের দুধে বিদ্যমান প্রোটিনের পরিমাণ, পরোক্ষভাবে নবজাতকের পরিপক্কতার সমানুপাতিক। অন্যভাবে বলতে গেলে, বাচ্চা বয়সের দিক থেকে যত ছোটো হবে, মায়ের দুধে প্রোটিনের পরিমাণও তত বেশি হবে। বস্তুত দুধে প্রোটিনের পরিমাণ ধ্রুবক নয় এবং প্রতিদিন, এমনকি একই দিনের বিভিন্ন সময়ে, বাচ্চার প্রয়োজন অনুসারে এটি পরিবর্তিত হতে থাকে।

সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর এত সব উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে মায়েদের এই কাজ থেকে বিমুখ করার যে প্রচারণা, এটা পুরোটাই ব্যবসায়িক। বোতলজাত দুধ খাওয়ানোকে সহজাত বানিয়ে ফেলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এটা একটা বড়ো সিন্ডিকেটের অংশ। এসব ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম হিসেবে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং সাধ্যমতো অন্যদেরও সচেতন করতে হবে। সন্তানের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মায়ের স্তনে দুধের সৃষ্টি করেছেন। বোতলজাত ও ফরমুলা দুধ হলো ফ্যাক্টরিতে তৈরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অদূরদর্শী লোকবল দ্বারা প্রস্তুতকৃত।

গর্ভাবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে হবে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাচ্চাকে দুধপান করানোটা সহজ করে দেন। আরও দুআ করতে হবে, সন্তান ও মা উভয়ের জন্য এই প্রক্রিয়া চালিয়ে নেওয়া যতদিন উত্তম হবে, ততদিন যেন আল্লাহ তাআলা সক্ষমতা দিয়ে দেন।

স্তন্যপানের সময় কিছু কিছু নারী সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। বিশেষ করে প্রথম কয়েক দিন এবং কয়েক সপ্তাহ। বাচ্চা ও মা উভয়েই যেহেতু কেবল শিখতে শুরু করে, তাই এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। মাতৃ-স্তনে দুধের

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৩

পর্যাপ্ত যোগান না থাকা, বাচ্চা খেতে অনীহা দেখানো ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোতলজাত দুধ খাওয়ানো ছাড়া অন্য উপায় হয়তো থাকে না। অস্থায়ীভাবে এই পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতে পারি। এই বিষয়টারও আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারি। কারণ, কোনো ক্ষেত্রে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছায় সন্তানকে স্তন্যপানের ইচ্ছাটি বাস্তবায়ন না হয়, তখন এই দক্ষতাটি কাজে দেবে। আমরা যারা এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হব, তারা স্তন্যপান ও বোতলজাত দুধ পান করানো, উভয় পদ্ধতির জন্যই সাওয়াব পেয়ে যাব, ইন শা আল্লাহ!

আরও একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার—একজন সন্তান দুধ পান করার বয়সে থাকাবস্থায় যদি অন্য আরেকজন গর্ভে চলে আসে, তাহলে প্রথমজনকে নিশ্চিন্ত মনে দুগ্ধ পান করানো যাবে। এতে মা কিংবা অনাগত সন্তানের কোনোপ্রকার ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকেও আমরা বিষয়টির সাক্ষ্য পাই। তিনি বলেছেন—

> 'আমি গর্ভবতী অবস্থায় স্তন্যপান করানোকে নিষিদ্ধ করার চিন্তা করেছিলাম; কিন্তু পরবর্তী সময়ে রোম ও পারস্যবাসীকে দেখেছি, তারা গর্ভাবস্থাতেও তাদের আগের সন্তানকে দুধ পান করায় এবং এতে বাচ্চার কোনো ক্ষতি হয় না।'[১]

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৪৩৩

গর্ভবতী নারীর স্বামীরা

কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ বান্দার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হলো এই যে, তিনি তোমাদের ভেতর থেকেই তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার; আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।[১]

গর্ভাবস্থার ওপর আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেন বাচ্চার বাবার কথা ভুলে না যাই। আমাদের প্রিয় স্বামীরা হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যারা কিনা গর্ভকালীন সময়ের এই উত্তেজনা এবং বাচ্চার সাথে আমাদের ভালোবাসার বন্ধন তৈরির মুহূর্তে পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করেন। গর্ভকালীন সময়ের পূর্বে, চলাকালীন সময়ে, এবং পরে আমাদের যে সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়—তা কিন্তু আমাদের স্বামীরাই ব্যবস্থা করেন। শারীরিক ও মানসিকভাবে তারা সবসময় আমাদের পাশে থাকেন। তাদের সন্তানকে নিজেদের জঠরে ধারণের মাধ্যমে তাদের মনে আমাদের জন্য নতুন করে একটি সুন্দর অনুভূতির

[১] সূরা রুম, আয়াত : ২১

সৃষ্টি হয়। এই সময়টি হলো আমাদের স্বামীদের তরফ থেকে বিশেষ যত্ন পাওয়ার সময়। গর্ভকালীন এই সময়টিতে অনেক পুরুষই স্ত্রীদের যত্নে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> 'ঈমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিখুঁত হলো সেই ব্যক্তি, যার আচার-আচরণ চমৎকার; আর তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম—যারা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করে।'[১]

একজন গর্ভবতী নারী হিসেবে, সমাজ প্রায়শই আমাদের স্বামীদের কাছ থেকে (হয়তো বাকি সবার কাছ থেকেও!) আমাদের প্রতি যত্নবান হওয়াটা আশা করে। গর্ভাবস্থায় যারা জটিল শারীরিক বা মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে যান না, তাদের ক্ষেত্রেও স্বামীর কাছে এই যত্ন আশা করাটা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু, একজন স্ত্রী হিসেবে এই সময়ে আমাদেরও যে সমানভাবে স্বামীদের পাশে থাকতে হবে—এই ধারণাটি কেন জানি পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়। আমাদের পক্ষ থেকে, একজন মুসলিম নারী হিসেবে, এই বিষয়টি পুনঃমূল্যায়ন করে দেখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে অনিঃশেষ ভালোবাসা আর সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে। কুরআন কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা করেছেন—

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ
لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

> রামাদানের রাতে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ.. ।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বর্ণনাকৃত এই সুরক্ষা, অলঙ্করণ, ও সমর্থনের ভূমিকা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। গর্ভাবস্থায় এমন কোনো অজুহাতের সময় নেই, যখন আমাদের প্রিয় স্বামীরা তাদের

[১] তিরমিজি, হাদিস : ১১৬২
[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

কর্তব্য পালন করবে আর আমরা স্ত্রীর ভূমিকা পালন করা হতে বিরত থাকব। উদাহরণস্বরূপ, গর্ভকালীন সময়ে হয়তো আমাদের কাছে দুপুর পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকার অজুহাত থাকতে পারে; কারণ, সকালে আমরা হয়তো ভালো অনুভব করিনি বা রাতে হয়তো আমাদের ভালো ঘুম হয়নি। কিন্তু যখন আমরা ভালো অনুভব করব, তখন স্বামীদের সাথে খোশ দিলে কথা বলব, যেভাবে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় বলি। তার কোনো প্রয়োজনের ব্যাঘাত ঘটছে কি না—সেটারও তদারকি করব।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—

> 'আমি কি তোমাকে একজন মানুষের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ কী, তা বলব? তা হলো—একজন উত্তম স্ত্রী। যদি সে স্ত্রীর দিকে তাকায় এবং স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়। যদি সে হুকুম করে স্ত্রী তা পালন করে এবং যদি সে স্ত্রী থেকে দূরে কোথাও যায়, স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।'[১]

স্বামীর জন্য নিজেকে পরিপাটি করে রাখার চেষ্টার সাথে আমরা হাদিসের কথাগুলো মেলাতে পারি। নিজেদের আমরা প্রশ্ন করতে পারি—'আমি কি সুন্দর করে সেজেছি ধাত্রীর উদ্দেশ্যে নাকি আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে? ডাক্তারের কাছে যাব বলেই কি পরিপাটি পোশাক-আশাকে নিজেকে সজ্জিত করছি, নাকি স্বামীর সাথে বসে বিকেলবেলা আলাপ করব বলে?

শুধু স্বামীর জন্যেই নয়, নিজেদের সর্বদা গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করলে মন প্রফুল্ল থাকে আর নিজের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় লাগে। এই পুরো বিষয়টি সকলের জীবনে এক আনন্দময় পরিবর্তনও নিয়ে আসে!

হঠাৎ করে বার্গার বা মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হলে রাত ২টা বাজলেও স্বামীরা সেটা কিনে আনতে দ্বিধা করেন না। ঘনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের অনেক আত্মসংযম ও নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করতে হয়। সহানুভূতিশীল স্বামীরা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময় নিয়ে বেশ ভালোভাবেই সচেতন থাকেন। ক্লান্ত বা

[১] আবু দাউদ, হাদিস : ১৬৬৪

অসুস্থ থাকা অবস্থায়, বা ঠিকভাবে ঘুম না হওয়ার কারণে অবসাদগ্রস্ত থাকায় এবং এ-রকম আরও অনেক বিশেষ মুহূর্তে তারা কখনোই ঘনিষ্ঠ হওয়া নিয়ে জোর করেন না। এর বিনিময়ে আমাদেরও বোঝা উচিত যে, আমাদের গর্ভকালীন সময়টি আমাদের স্বামীদের জন্যও এক বিশাল পরিবর্তনের সময়।

আমাদের ভিন্ন ভিন্ন আবেগ ও পরিবর্তনশীল দৈহিক অবস্থার সাথে স্বামীদেরও মানিয়ে নিতে হয়। আমাদের ভেতরে যে একটি ছোট্ট প্রাণ বেড়ে উঠছে সেই বিষয়টির সাথেও তাদের নিজেদের অভ্যস্ত করে নিতে হয়! গর্ভবতী নারী হিসেবে এই সমন্বয়গুলো আমাদের অগ্রযাত্রার সঙ্গী। আমাদের স্বামীদের তুলনায় এই অবস্থার সাথে আমরা বেশ তাড়াতাড়ি খাপ খাওয়াতে সক্ষম হই; কারণ, গর্ভের সন্তানের সাথে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের অনিশ্চিত আবেগীয় পরিবর্তনসমূহ অন্যের কাছে হয়তো অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হবে, কিন্তু আমাদের কাছে তা মার্জনীয় বলে মনে হয়। তবে আমাদের স্বামীরা যদি এই বিষয়ে সহানুভূতিশীল না হয়, তখন আমরা বিষণ্ন হয়ে পড়ি। গর্ভবতী নারীদের আবেগ মাঝে মাঝে উচ্চমাত্রার ও অবাধ্য প্রকৃতির হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে এটা আমাদের ও বাকি সকলের জন্য একটি সতর্কবার্তা। দোষটা দুনিয়ার নয়, বরং আমাদের উচ্চমাত্রার হরমোন নিঃসরণের। এই পরিবর্তনশীল আবেগের সাথে খাপ খাওয়ানোর অভ্যাস আমাদের করে নেওয়াই বরং ভালো, তা না হলে এই অশান্ত আবেগের রাজত্ব চলতেই থাকবে। তাই সময় বের করে, বিশ্রাম করে, আরাম ও নিরাপদ ব্যায়াম করার মাধ্যমে আমরা আমাদের বাধাহীন হরমোন মাত্রার ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

আমাদের গর্ভকালীন সময় নিয়ে স্বামীরা যদিও খুব তাড়িত থাকেন, তবুও একজন হবু মা হিসেবে আমরা যতটা অভিভূত হওয়ার সুযোগ পাই, তারা সেটা পায় না। আমরা সব কিছু একজন গর্ভবতী নারীর চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করি। আমাদের স্বামীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এমন নাও হতে পারে।

আমরা হয়তো সন্তানের অনিষ্ট নিয়ে অকারণেই দুশ্চিন্তা করি, ক্লান্ত ও খিটখিটে হয়ে থাকি। কেবল চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর কথা ভাবি। হয়তো জেগে থাকতে চাই এবং বাচ্চার কী রকম দোলনা কেনা হবে, শীতের পোশাক কী রকম হবে, লোশান কোন ব্রান্ডের হবে—সে-সব নিয়ে কথা বলতে চাই। স্বামীদের কাছে বিষয়গুলো ততটা জরুরি মনে না-ও হতে পারে এবং সেগুলো নিয়ে উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক ঠেকতে পারে। ওই সময়টাতে তারা হয়তো বাচ্চাকে নিয়ে ভাবতে চাচ্ছে না, তারা শুধু স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে চাচ্ছে। আমাদের উচিত স্বামীদের এই সংবেদনশীলতা বোঝা, তাদের আবেগ অনুভব করা এবং সেটাকে মূল্যায়ন করা।

আমাদের ক্লান্তি, অসুস্থতা কিংবা অন্য কোনো অসুবিধের কথা আলাদা বিষয়, কিন্তু গর্ভাবস্থার সুস্থ সময়ে স্বামীর আবদার পূরণ করা, তার ডাকে সাড়া দেওয়া, তার অনুগত হওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এটা নিশ্চিত করা গেলে আমাদের প্রতি স্বামীর ভরসা, বিশ্বাস, ভালোবাসা আর সৌহার্দ্য যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি আমাদের দাম্পত্যজীবনেও সেটা মধুর হয়ে ধরা দেয়। সময়টাকেও আমাদের কাছে বিরক্তিকর অথবা অকেজো লাগে না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত, আর তা হলো—গর্ভাবস্থায় আমাদের অতি উচ্চমাত্রার অনিয়ন্ত্রিত আবেগ। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের রাগ ও নেতিবাচক আচরণের স্বীকার স্বামীরাই বেশি হয়ে থাকেন। অনেক স্বামীরা তো আপসোস করে বলেই ফেলেন যে—'গর্ভবতী নারীর সাথে সংসার করাটা বেশ কষ্টসাধ্য। এই কষ্ট সয়ে যাওয়ার জন্য নয় মাস অত্যন্ত লম্বা সময়!'

আমাদের বুঝতে হবে যে, স্বামী বেচারারাও মানুষ এবং তারাও ভুল-ত্রুটি, রাগ-ক্ষোভ, আবেগ-উচ্ছলতার ঊর্ধ্বে নয়। এমন অনেক দিন আসবে যেদিন তারা আমাদের প্রয়োজন অথবা পছন্দ অনুসারে কাজ করে দিতে পারবেন না। মানুষ হিসেবে আমরা যেমন নিখুঁত নই, তারাও সে-রকম। তারাও সর্বদা আমাদের মনের কথা পড়তে পারেন না।

আমাদের উচিত অন্যের অনুভূতি বিষয়ে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা, বিশেষ করে যারা আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ তাদের ক্ষেত্রে। আমাদের স্বামীরা মাঝেমধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারেন এবং বলেও ফেলতে পারেন—'আরেহ, তুমিই তো নিজে থেকে সন্তানের জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলে। আর এখন দেখছি শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ!'

স্বামীরা যখন অবদমিত রাগের বশে এমন কথাবার্তা বা কাজকর্ম করে ফেলেন, হতে পারে হাতের গ্লাসটা দূরে ছুঁড়ে মারলেন কিংবা টেবিলে জোরে আঘাত করলেন, তখন আমাদের উচিত নিজেদের সংযত করা এবং স্বামীর সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে না পড়া। যদি পাল্টাপাল্টি তর্কবিতর্কে অংশ নিয়ে জিততে চাই, বিষয়টা এমন পর্যায়ে গড়াবে যা অত্যন্ত অসুন্দর এবং অকল্যাণের। এমন অবস্থায় আমরা তাদের বুঝতে চেষ্টা করব। জানি—তিনি যে কাজটা বা যে কথাটা বলেছেন তা অযৌক্তিক, অশোভন, অসুন্দর; কিন্তু যৌক্তিক, শোভন আর সুন্দর কাজ কি তিনি করেন না আমাদের জন্য? এমন অবস্থায় আমরা তাদের সেই সুন্দর আচরণ, সুন্দর কাজ আর কথাগুলোর কথা স্মরণ করতে পারি, যা তারা আমাদের জন্য সব সময় করেন। এতে করে তাদের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে যেমন বাঁচা যাবে, তেমনি নিজেকে সংযত করার ব্যাপারেও আমরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারব। কারও প্রতি ইহসান করার অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই—তার ভুলগুলো ক্ষমা করার জন্য অজুহাত খোঁজা, তার ত্রুটিগুলো উপেক্ষা করা।

হামদুন কাসসার এই ব্যাপারে একটি সুন্দর কথা বলতেন। এখানে সেটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলতেন—'তোমার বন্ধুদের কেউ ভুল করলে তার জন্য সত্তরটি অজুহাত তালাশ করো। যদি তোমার অন্তর তা গ্রহণ না করে, তাহলে জেনে রাখো, তোমার অন্তরে সমস্যা আছে।'

মাঝে মাঝে, আমরা আমাদের বন্ধু ও সহকর্মী, কিংবা একদম অপরিচিত ব্যক্তির সাথে খুব উদার, ভদ্র এবং আমাদের সবচেয়ে উত্তম আচরণটি করে থাকি; কিন্তু আমাদের সবচেয়ে কাছের ও প্রিয় মানুষের বেলায় আমরা

তেমনটা করি না। তাদের সাথে আমরা খুব কটমটে চেহারায়, কর্কশ ভাষায় কথা বলি। এটা কোনোভাবেই উচিত নয়। আমাদের উত্তম আচরণের সর্বপ্রথম হকদার আমাদের প্রিয়জনেরাই—যারা আমাদের আশেপাশে থাকেন।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার শারীরিক এবং মানসিক সম্পর্কের অবস্থা তাদের দাম্পত্য জীবনের অবস্থার সূচক হিসেবে কাজ করে। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল, কতটা অনুগত, যত্নশীল এবং বিশ্বস্ত তার ওপরে নির্ভর করে তারা কতখানি সুখে আছে। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, গর্ভকালীন সময়ে স্বামী-স্ত্রীর ওপর ক্রমবর্ধমান মানসিক চাপকে সুন্দরভাবে সামলানো যায় না বলে অধিকাংশ পরিবারে সেটা নাজুক পরিস্থিতি তৈরি করে—যা সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায়। একজন গর্ভবতী নারীর সাথে যা হওয়া উচিত ছিল, দেখা যায় অনেকসময় তার বিপরীত ঘটনাটাই ঘটতে থাকে।

এ-সব চমকপ্রদ পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আরও লক্ষণীয় কিছু বিষয় চোখে পড়ে। সব পুরুষ কিন্তু স্ত্রীদের প্রতি একই রকম ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মানসিকতা প্রকাশ করতে পারেন না, যেমনটা অধিকাংশ নারীরা আশা করে থাকেন। যদিও গর্ভকালীন সময়ে অনেক নারী আংশিক বা পুরোপুরিভাবে ঘরের কাজ করা চালিয়ে যান, বড়ো সন্তানের যত্ন নেন এবং পরিবারের অন্য সদস্যদেরও খেয়াল রাখেন। অনেক সময় আমাদের বিরতির প্রয়োজন হয়। গর্ভাবস্থার নানা জটিলতার দরুন আমরা হয়তো আগের মতো সব সময় রান্না করা এবং ঘর পরিষ্কার করার কাজটি করতে পারি না। কিছু নারী হয়তো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন ও সাংসারিক কাজ করতে অসমর্থ হয় এবং কিছু নারী হয়তো ঘুরে বেড়ানোর সেই সাধটা আর উপভোগ করতে পারেন না। স্বামীদের উচিত মানিয়ে নেওয়ার মনোভাব তৈরি করা, বাড়ির ছোটখাটো কাজগুলো যথাসম্ভব করার চেষ্টা করা, দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেওয়া এবং আমরা যখন কাজ করতে অসমর্থ হবো, তখন আমাদের বিশ্রাম দেওয়া। স্বামীদের মনে রাখা উচিত—গর্ভবতী একজন

নারী সম্পূর্ণ নতুন একটা প্রাণ তার জঠরে ধারণ করছে যে প্রাণের তিনিও সমান অংশদার।

একজন উত্তম স্ত্রী এবং একজন উত্তম স্বামী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য একসাথে কাজ করা জরুরি, অন্যসময়ে-ও এবং বিশেষত গর্ভকালীন সময়ে তো বটেই। কাজেই আমরা দুআ করি—আমাদের গর্ভকালীন সময়টুকু যেন আমাদের নিজেদের এবং আমাদের স্বামীদের জন্য আনন্দময় হয়। আমিন।

অনাগত অতিথির জন্য

ভালোবাসা, ভালোবাসি

হাত এবং পায়ের ছোটো ছোটো আঙুল। বোতামের মতো ছোট্ট একটা নাক। তুলতুলে গা। চোখ দুটো পিটপিট করে তাকাবে সে। আচ্ছা, সে কি আমার মতো দেখতে হবে নাকি তার বাবার মতো?

আমাদের সন্তান কার মতো দেখতে হবে সেটা আমরা কল্পনা করি। যেদিন তার জন্ম হবে, সেদিন তাকে কোলে নেওয়ার মুহূর্তটা কেমন হবে, সেটা চিন্তা করি। আলতোভাবে, স্নেহের সাথে পেটে হাত বুলিয়ে এই অদৃশ্য সত্তার সাথে কথা বলি, যাকে আমরা ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছি। আমাদের ভেতর বেড়ে ওঠা এই নতুন জীবনের জন্য আমরা সকল অসুস্থতা ও ব্যথা সহ্য করি। কারণ, সে আমাদের সন্তান।

অনাগত সন্তানের প্রতি আমাদের এই আসক্তির নামই বন্ধন। এ বন্ধন সময়ের সাথে সাথে আরও শক্তিশালী ও গভীর হয়। সন্তানের কাছ থেকে অনেক অনুভূতি, অনেক জীবনবোধ আমরা শিখি এবং এই প্রক্রিয়া সে গর্ভে থাকাবস্থায়-ই শুরু হয়।

অদেখা সন্তানকে গভীরভাবে ভালোবাসার ও অনুভব করার বিষয়টি আমাদের সামনে আরও একটা জিনিসকে খোলাসা করে দেয়, আর তা হলো, আমাদের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা, এবং নবীজির জন্য আমাদের ভালোবাসা। নবীজি কিন্তু আমাদের দেখেননি। আমরা কেমন, কী আমাদের গায়ের রঙ, কী আমাদের পছন্দ-অপছন্দ—তার কোনোকিছুই তিনি জানতেন না। তবুও সেই কত আগে—সাড়ে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বের পৃথিবীতে বসে তিনি অকাতরে আমাদের জন্য ভালোবাসা বিলিয়ে গেছেন। তাঁর উম্মতের জন্য দুআ করে গেছেন,

তাদের জন্য বাতলে দিয়ে গেছেন সর্বোত্তম জীবনপদ্ধতি। আবার, আমরাও কিন্তু নবীজিকে দেখিনি কেউ। তারপরেও তাঁকে মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসি। এই যে না দেখে নবীজিকে ভালোবাসার নমুনা, আমাদের অনাগত সন্তানেরা সেটা আমাদের নতুন করে অনুভব করিয়ে যায়।

অনাগত সন্তানের জন্য পুষে রাখা ভালোবাসা এবং তার সার্বিক কল্যাণ-চিন্তা মাঝে মাঝে রূপ নিতে পারে ভয় আর উদ্বেগে। তাদের সুস্থতা, শারীরিক-মানসিক-আত্মিক বিকাশ, এবং সর্বোত সুখী জীবনের জন্য আমরা সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করতে থাকব। ফুলের মতো সুন্দর যেন হয় তাদের চরিত্র। যেন কুসুম-কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে, মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে আখিরাতে আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হতে পারে—মা হিসেবে এই দুআ জারি রাখা অবশ্য কর্তব্য।

সন্তানদের নিজস্ব জগতের ভিত্তি স্থাপনের কাজটা আমাদেরই করতে হবে। তাদের যদি মহীরুহ হিসেবে দেখতে চাই, চারাগাছ থাকাবস্থায় পর্যাপ্ত যত্নটা তো করতেই হবে। তারা দুনিয়ায় এসে প্রথম শ্বাস নেওয়ার বহু আগে থেকেই আমরা তাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপনের প্রস্তুতি নিতে থাকি। এভাবেই গর্ভকালীন সময়টি হয়ে ওঠে একটু সম্মিলিত প্রচেষ্টা পর্ব।

আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি!

আমাদের ট্রাউজারের ইলাস্টিক একটু একটু করে অস্বস্তিকর লাগা শুরু করেছে এবং তা সত্ত্বেও আমাদের মুখ কিন্তু হাসি হাসি। একটা অবাধ খুশির ফোয়ারা যেন আমাদের দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্ভাবস্থার এই পর্যায়ে এসে আমরা বুঝতে পারি যে—অদেখা এক নতুন অতিথি এখন আমাদের চারপাশের আওয়াজ শুনতে পায়। কী দারুণ ব্যাপার! আমাদের কথা, আমাদের দৈনন্দিন কাজের টুংটাং শব্দও সে শুনে ফেলে। মনে পড়তেই আমরা যেন খিলখিল করে হেসে ফেলি।

আমরা তাকে গান শোনাই, ছড়া শোনাই, তিলাওয়াত শোনাই। সোনা-মানিক ছাড়াও আরও কত আদুরে শব্দ দিয়ে তাকে ডাকি। সে জবাব দেয় না, কিন্তু জেগে থাকলে ঠিকই শোনে এসব। তার কি ইচ্ছে করে জবাব দিতে? তার মুখ কি নড়াচড়া করে? চোখ মেলে সে কি তাকায়? কত কত প্রশ্ন যে মনে জাগে—তার ইয়ত্তা নেই। তার এই অদৃশ্য উপস্থিতির মাধ্যমে সে হয়ে ওঠে আমাদের জগতের অংশ।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক, অর্থাৎ গর্ভে সন্তানের বয়স চার মাস হওয়ার পর থেকেই কিন্তু তারা আমাদের শুনতে পায়। এতদিন তারা ছিল আমাদের দেহের অংশ। আমাদের টেনে নেওয়া অক্সিজেন ছিল তাদের নিঃশ্বাসের সম্বল। আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যই ছিল তাদের খাবারের উৎস। কিন্তু আজ থেকে সেই যাত্রায় যোগ হলো নতুন কিছু। আজ থেকে সে আমাদের শুনতেও পায়। আমাদের আদরমাখা ডাক, স্নেহ-মাখা স্বর পৌঁছে যায় তার কর্ণকুহরে!

গর্ভাবস্থার প্রথম মাসেই বাচ্চাদের কান গঠিত হতে শুরু করে। তবে পুরোপুরি গঠন হওয়ার পূর্বেই তারা সব শুনতে ও সাড়া দিতে পারে। গর্ভাবস্থার অষ্টম সপ্তাহে বাচ্চা শ্রবণ করার শক্তি লাভ করে। বিশতম সপ্তাহে গিয়ে সেটা পূর্ণ হয় এবং চব্বিশতম সপ্তাহে গিয়ে সে সক্রিয়ভাবে শ্রবণশক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই সময়কালে সে রান্নাঘরে আমাদের কাজ করার শব্দ, ফ্রিজ খোলার শব্দ কিংবা স্বামীর সাথে করা খোশগল্পের শব্দ—সমস্তকিছুই সে শুনতে পায়। আট মাসের মধ্যেই তাদের সেই শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক মানুষের শ্রবণশক্তির পর্যায়ে পৌঁছায় এবং তখন তারা সবকিছু স্বাভাবিক মানুষের মতো করেই শোনে—মায়ের পেটে থাকতেই।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তথ্য হলো—বাচ্চারা মায়ের কণ্ঠই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকে। কানাডার ওন্টারিও-র 'কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বারবারা কিসিলেভ্সকি বলেন—

> 'মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে গর্ভের বাচ্চারা বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কণ্ঠটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং আপন।'

শুধু তা-ই নয়, জন্মের পরও তারা মায়ের কণ্ঠস্বর মনে রেখে দেয় এবং কণ্ঠস্বর শুনে ঠিক ঠিক বুঝে নেয় কোনজন তার মা। অনেক নবজাতকের বেলায় খুব স্বাভাবিক ঘটনা এটা। দেখা যায় জন্মের পর সে এতবেশি কান্নাকাটি করছে যে কেউ তাকে কোনোভাবে থামাতেই পারছে না। তারপর মায়ের কোলে যখন দেওয়া হয়, মা যখন উষ্ণ আলিঙ্গনে তাকে বুকে টেনে নেয় এবং আদুরে গলায় ডাকে, তখন তার গগনবিদারি চিৎকার মুহূর্তেই থেমে যায়। মায়ের উষ্ণতা এবং কণ্ঠস্বর সে গর্ভে থাকতেই চিনে এসেছে এবং মনে রেখে দিয়েছে।

আরও একটা বিষয় এই সময় লক্ষ করা যায়। গর্ভে থাকাকালীন বাচ্চারা যে সকল শব্দ নিয়মিত শোনে, সেই শব্দের প্রতি 'সাড়া' দেওয়ার মতো একপ্রকারের আচরণ তাদের মাঝে গড়ে ওঠে। ধরা যাক কোনো গর্ভবতী নারী অত্যধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করেন। জন্মের পর দেখা যাবে, কুরআনের তিলাওয়াত শুনলে বাচ্চাটা শান্ত হয় অথবা সাড়া দেয়।

কেউ যদি অত্যধিক জিকির-আজকার করে, সন্তানও সেটা শুনলে সাড়া দিতে থাকবে।

শুধু মায়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারাই নয়, মায়ের আবেগ দ্বারাও তাড়িত হতে পারে গর্ভের সন্তান। গর্ভাবস্থায় আমরা যখন কোনো অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাই, তখন আমাদের মধ্যে একধরনের এনজাইম তৈরি হয়। খুব সম্ভাবনা থাকে—এই এনজাইম নাড়ির মাধ্যমে গর্ভের সন্তানের মাঝেও সঞ্চালিত হওয়ার। ফলে, গর্ভাবস্থায় যদি আমরা সর্বদা রেগেমেগে অস্থির থাকি, খিটখিটে হয়ে থাকি এবং অগোছালো জীবনযাপন করি, আমাদের এই আচরণের প্রভাব সন্তানের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আবার, আমরা যখন আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করব, যে-কোনো কিছুতে রেগে অস্থির না হবো, ধৈর্যধারণ করব, আমাদের সন্তানও সেই আচরণ রপ্ত করবে।

চোখ ঝলসে দেওয়া আলো নেই—এমন একটা ঘরে বসে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে পারি। তারপর কুরআন কারিমের কিছু প্রিয় অংশ বারংবার তিলাওয়াত করতে পারি এবং সেই সাথে হাত বুলাতে পারি পেটে। যদি সন্তান নড়েচড়ে ওঠে, তাহলে কাজটা প্রতিদিন নিয়ম করে চালিয়ে নিতে পারি। সন্তান যদি এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, জন্মের পর তাকে শান্ত করতে বাবা-মা'র খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। সে অবিশ্রান্তভাবে কান্নাকাটি শুরু করলে আমরা কুরআন কারিম তিলাওয়াত শুরু করতে পারি। এতে সে শান্ত হবে, যেমনটা হতো গর্ভে থাকতে। বাচ্চাকে শান্ত করার জন্য পরিচিত শব্দ ব্যবহার করার পেছনে যুক্তি হলো, যা কিছু তাদের গর্ভে থাকাকালীন আরামদায়ক সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, জন্মগ্রহণ করার পর সেই একই বিষয়গুলো তাদের জন্য সান্ত্বনার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। এই জন্যই বাচ্চাকে বুকের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখলে তারা শান্ত হয় কারণ মায়ের গর্ভে তাদের বেশ আঁটসাঁটভাবে থাকতে হয়েছে। মায়ের হৃদস্পন্দন শুনতে শুনতে তারা অভ্যস্ত।

তার জন্য বদলে যাব

প্রতিটা বাবা-মায়ের মনে একটা সুপ্ত ভয় বিদ্যমান থাকে আর সেটা হলো—তাদের মৃত্যুর পর সন্তানের কী হবে? ভয়টা অমূলক নয়। তবে, আমরা যদি নিজেদের উত্তম অভিভাবক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি, যদি নিজেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সালিহ বান্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সেই ভয় অনেকখানি দূরীভূত করা সম্ভব, ইন শা আল্লাহ। সূরা কাহাফে আমরা এমন একটা ঘটনা দেখতে পাই, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উত্তম অভিভাবককূলের সন্তানের ওপর তাঁর করুণার দৃষ্টি রাখেন বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا
أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ
فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

'তারপর তারা উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তারা এক জনপদে পৌঁছে সেখানকার লোকেদের কাছে খাবার চাইল। তবে তারা তাদের দুজনকে আতিথ্য প্রদানে অস্বীকার করল। তারা দুজন সেখানে একটা দেওয়াল দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। তখন সে ব্যক্তি দেওয়ালটি দাঁড় করিয়ে দিল। মুসা বলল—'আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।'[১]

[১] সূরা কাহফ, আয়াত : ৭৭

বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার লোক দুনিয়াতে সত্যিই বিরল। তার উপর অচেনা-অজানা লোকের জন্য দেওয়াল মেরামতের মতো শ্রমসাধ্য কাজ করে দেবে—এমন লোকের কথা তো কল্পনায়ও ভাবা যায় না। আরও ভাবনার বিষয় হচ্ছে—মুসা আলাইহিস সালাম আর খিজির আলাইহিস সালাম দুজনে সেই এলাকায় খাবার চাইলে তারা তাদের একগ্লাস পানি পর্যন্ত দেয়নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও, খিজির আলাইহিস সালাম নিজ উদ্যোগে, স্বপ্রণোদিত হয়ে সেই বাড়ির একটা ভগ্ন-প্রায় দেওয়াল মেরামত করে দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন সেই ঘটনাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন পরের আয়াতে—

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

> আর ওই দেওয়ালটির বিষয় হলো—তা ছিল ওই শহরের দুজন ইয়াতিম বালকের। তার নীচে ছিল তাদের জন্য রক্ষিত ধন, তাদের পিতা ছিল এক সৎ ব্যক্তি। তাই তোমার প্রতিপালক চাইলেন তারা দুজন যৌবনে উপনীত হোক আর তাদের গচ্ছিত ধন বের করে নিক—যা হলো তোমার প্রতিপালকের বিশেষ রহমত। এ-সব আমি নিজের পক্ষ থেকে করিনি। এ হলো সে বিষয়ের ব্যাখ্যা, যে-ব্যাপারে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি।[১]

তাদের খাবার না দেওয়া, আতিথ্য না দেওয়া এলাকার যে দেওয়াল খিজির আলাইহিস সালাম মেরামত করে দিয়েছেন সেটার আসল মালিকানা ছিল দুজন ইয়াতিম বালকের। বালকদ্বয়ের বাবা মারা গেলে তা হস্তগত করে নেয় অন্য লোক। কিন্তু, বালকদ্বয়ের জন্য তাদের বাবা যে দেওয়ালের নিচে

[১] সূরা কাহফ, আয়াত : ৮২

গুপ্তধন লুকিয়ে রেখে গেছেন, সেটা দখলকারীরা জানত না। কিন্তু দেওয়ালটা যদি এভাবে ভাঙতে থাকে, একদিন সেই গুপ্তধন প্রকাশ্যে চলে আসবে এবং তা ওরা জবরদখল করে ফেলবে। তাই খিজির আলাইহিস সালাম দেওয়ালটা ভালোভাবে পুনর্নির্মাণ করে দেন, যাতে বালক দুজন যুবক বয়সে পৌঁছার আগপর্যন্ত সেই দেওয়াল টিকে থাকে, আর গুপ্তধনও সুরক্ষিত থাকে। তারা যৌবনে পৌঁছার পর সেই গুপ্তধন প্রকাশ্যে এলে আর কোনো ক্ষতির আশংকা থাকবে না; কারণ, তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। এই পুরো কাজটা খিজির আলাইহিস সালামকে দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন করিয়েছেন? উত্তরটা উপরের আয়াতেই আছে। কারণ, তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎ ব্যক্তি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি! নাবালক দুই বালকের সম্পদ সংরক্ষণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং খিজির এবং মুসা আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শুধু এই কারণে যে— তাদের পিতা ভালো মানুষ, আল্লাহওয়ালা ছিলেন।

অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে তাদের জীবন কীভাবে কাটবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়ই আমাদের চিন্তিত হতে হয়। তবে, আমরা যদি সূরা কাহাফে বর্ণিত সেই দুই বালকের পিতার মতো নিজেদের গড়তে পারি, যদি নিজেদের উন্নীত করতে পারি আল্লাহর সালিহ বান্দাদের দলে, তাহলে আমাদের সন্তানদের জন্যেও আমাদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাহায্যকারী মিলিয়ে দেবেন, যারা তাদের আগলে রাখবে, দেখভাল করবে, ইন শা আল্লাহ।

গর্ভাবস্থার সময়টুকুতে সন্তানের জন্য আমরা সে-রকম একজন মা হওয়ার পথে অগ্রসর হতে শুরু করতে পারি, যে-রকম মা হওয়া গেলে সন্তানদের বিপদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রদান করেন। তাদের জন্য আমরা বদলে যেতে পারি। বদলে নিতে পারি জীবনের অনেক কিছুই, ইন শা আল্লাহ।

বাচ্চার জন্য কুরআন

আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে তা সমানভাবে গর্ভের সন্তানও শুনতে পায়। তাই নিজেদের ঘর পরিষ্কার কিংবা রান্না করার সময়, গাড়িতে চড়ার সময় অথবা এক কাপ চা হাতে অবসর যাপনের সময় সুযোগ হলেই আমরা গুনগুন করে কুরআন কারিম তিলাওয়াত শুরু করব। অনেকে কুরআন কারিমের অডিয়ো প্লে করে রাখেন ঘরে বা শোয়ার রুমে। এটা খারাপ নয় যদিও, তবে সবচেয়ে উত্তম হলো যদি আমরা নিজেরা তিলাওয়াত করতে পারি। কারণ, গর্ভের শিশুর কাছে আমাদের নিজেদের কণ্ঠ যেভাবে পৌঁছায় আর যে আবেদন রাখে, অন্য কোনো শব্দ সে আবেদন তৈরি করতে পারে না। আর, নিজেরা তিলাওয়াত করলে তা নিজেদের জন্যও উত্তম। আমরা তো জানি—কুরআন কারিমের প্রতিটি হরফ উচ্চারণের বিপরীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দশটি করে নেকি দেন আমাদের। শুধু 'আলিফ লাম মিম' বললেই আমরা পেয়ে যাই ত্রিশটি নেকি! সুবহানাল্লাহ! তাই চেষ্টা করব গর্ভের শিশুকে নিজেরা কুরআন কারিম তিলাওয়াত করে শোনাতে।

অনেকেই একটু দ্বিধায় থাকে যে, গর্ভের শিশুকে শোনানোর জন্য কুরআন কারিমের কোন অংশ তিলাওয়াত করতে হবে। আদতে, এমন ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নেই। আপনি যেখান থেকে খুশি তিলাওয়াত করতে পারেন। কুরআন কারিমের যে অংশটা আপনার জন্য বেশি সহজ, সেই অংশ তিলাওয়াত করাই উত্তম হবে। তবে, বাচ্চাদের জন্মের পর আমরা সাধারণত কুরআন কারিমের শেষ পারার ছোটো সূরাগুলো শেখানোর চেষ্টা করি আগে। তাই, তারা গর্ভে থাকাবস্থায়ও যদি সেই ছোটো সূরাগুলোই

আমরা বেশি বেশি তিলাওয়াত করি, জন্মের পর সেগুলো তাদের কাছে অধিক পরিচিত পরিচিত মনে হবে।

কুরআন কারিম তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অনেকে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যেমন, যৌথ পরিবারে যেখানে স্বামী ছাড়াও ভাসুর, দেবর ইত্যাদি লোকজন থাকে, যাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা নিজেদের কণ্ঠস্বর অলংকৃত করার হুকুম নেই। এই অবস্থাগুলোতে আমরা চেষ্টা করব অত্যন্ত নিচু স্বরে হলেও কুরআন কারিমের তিলাওয়াত চালিয়ে যাওয়া। তিলাওয়াতের পাশাপাশি দৈনন্দিনের দুআগুলোও যদি আমরা পড়তে পারি নিয়ম করে, আমাদের গর্ভের সন্তান দুআর সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গুণবাচক নাম আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দুআর সাথেও পরিচিত হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।

কুরআন তিলাওয়াতের দায়ভার শুধু যে আমাদের একার—তা কিন্তু নয়, আমাদের স্বামীদেরও উচিত এই দায়িত্বে সমানভাবে অংশগ্রহণ করা। বাচ্চারা মায়ের কণ্ঠস্বরের পরে দ্বিতীয় যে কণ্ঠস্বরটাকে দ্রুত চিনে নেয়, সেটা হলো বাবার কণ্ঠস্বর। তাই, স্বামীদের সাথে আলাপ করে আমরা তিলাওয়াতের একটা নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করে নিতে পারি—যা প্রতিদিন নিয়ম মাফিক মেনে চলা হবে। রাতে ঘুমোনোর পূর্বে পালা করে আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এবং কুরআন কারিমের সর্বশেষ সূরা তিনটি তিলাওয়াত করা যেতে পারে। একসাথে বসে টিভি না দেখে, খুচরো আলাপ করে সময় নষ্ট করার চাইতে আল্লাহর কালাম নিয়ে আলোচনা করলে তা বাবা-মা এবং সন্তান উভয়ের জন্যেই উপকার বয়ে আনবে, ইন শা আল্লাহ।

আজকাল কত মানুষ কুরআন কারিম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ফরিয়াদ করব যেন আমরা, আমাদের পরিবার, আমাদের সন্তানেরা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত না হই। আজকাল কুরআন কারিম নিয়ে ভাবনা-চিন্তা হয় কম, আর্ট আর ক্যালিগ্রাফি করে ঘরের দেওয়ালে কুরআনের আয়াত ঝুলিয়ে রাখতেই মানুষের আগ্রহ

বেশি। কুরআন অন্তরে ধারণ করার জিনিস, শেলফে মুড়িয়ে রাখার জিনিস নয়।

গর্ভাবস্থা খুব চমৎকার একটা সুযোগ কুরআনের সাথে সময় কাটানোর। সত্যিকারভাবে বোঝা এবং অনুভব করার তাগিদে যদি কেউ কুরআন কারিম তিলাওয়াত করে, তাহলে কুরআন তার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে যাবেই। এটাই কুরআনের মুজিজা তথা বিস্ময়কর দিক। আমাদের উদ্দেশ্য হবে শুধু তিলাওয়াত নয়, আল্লাহর কালামকে গভীরভাবে অনুধাবন করা। আজকাল তাফসির, তাদাব্বুর এবং কুরআনের ব্যাখ্যা সর্বত্র সহজলভ্য। ইউটিউবে ভালো ভালো আলিম আর স্কলারদের সিরিজ ভিডিও পাওয়া যায় বিভিন্ন সূরার ওপরে। আমরা সেগুলো শুনতে পারি। প্রয়োজনীয় অংশগুলো নোট নিতে পারি এবং নিজেদের ভাবনাও লিখে রাখতে পারি। আমরা যদি আমাদের জীবনে কুরআন কারিমকে ব্যাপকভাবে জায়গা দিই, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কুরআন নিয়ে আরও বিশদভাবে কাজ করতে পারবে, ইন শা আল্লাহ।

কান সতর্ক রাখব!

'গান শুনলে হতাশা ভাব কাটে'—এমনটা অনেকে বলে থাকে। এ ধরনের উদ্ভট আর আজগুবি চিন্তা খুব কম আছে। গান শুনলে হতাশা ভাব কাটা তো দূরের বিষয়, বরং গানের মাধ্যমে শয়তান আমাদের অন্তর আরও শক্তভাবে গ্রাস করে ফেলে। এতে করে হতাশা বেড়ে গিয়ে তা চরমে পৌঁছানোর আশঙ্কাই বেশি থাকে। যেহেতু গর্ভাবস্থায় হতাশা কাজ করে বেশি, এই সময়টা অনেক নারী গান শোনাকে হতাশা কাটিয়ে ওঠার মাধ্যম হিসেবে নিয়ে থাকেন। দয়া করে আপনার কান সতর্ক রাখবেন। আপনাকে বুঝতে এবং মনে রাখতে হবে—গান এখন আপনি কেবল একা শোনেন না, আরও বাড়তি দুটো কানও সেগুলো সমানভাবে শোনে!

গান, বাদ্যবাজনা ইত্যাদি আজকাল সমাজে এত সাধারণভাবে মিশে গেছে যে, অনেকের কাছে এগুলো এখন আর ফিতনা বলে মনে হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ক্ষমা করেন। এমন একটা ফিতনাময় সময় যে আসবে, তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন। এ-জন্যেই তিনি বলে গিয়েছেন—

> 'আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমনকিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।'[১]

শুধু নবীজিই নন, তাঁর সাহাবিগণ, তাদের অনুসরণকারী প্রজন্ম (তাবিয়ি এবং তাবে তাবিয়ি) এবং চার মাজহাবের প্রখ্যাত চার ইমামই সঙ্গীত তথা

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫৯০

গান-বাজনাকে হারাম বলেছেন। সুতরাং গান-বাজনা শোনা এবং এটাকে হালাল মনে করা যে মারাত্মক গুনাহের কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একজন গর্ভবতী নারী হিসেবে দুটি অন্তর পরিশুদ্ধ রাখার গুরুদায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। একটি হলো আমাদের নিজের কলব তথা অন্তর। অন্যটি আমাদের ভেতরে বেড়ে ওঠা সেই বিশুদ্ধ ও নির্মল সত্তার অন্তর। কত অল্পদিনের মধ্যেই সেই ছোট্ট স্পন্দিত সত্তাটি আমাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করে, আমাদের উচ্চারিত শব্দাবলি শোনে, আমরা যা শুনি তাতেও সমানতালে ভাগ বসায়। সুতরাং, তাদের কানে গান বাজনার সুর, অশালীন কথাবার্তা ইত্যাদি পৌঁছাক—তা কি কখনো আমরা চাইতে পারি? একজন মুসলিম নারী এবং আদুরে একটা বাচ্চার মা-বাবা হিশেবে এটা তো আমরা কেউই চাই না। সুতরাং, যাবতীয় গান-বাজনা, যাবতীয় কু-আলাপ ইত্যাদি হতে নিজেদের কান বাঁচাতে হবে। নিজেদের কান হিফাজত করা গেলে, বেঁচে যাবে আমাদের ভেতরে বেড়ে ওঠা ছোট্ট সত্তাটার কানও।

এখনো বেশি দেরি হয়নি

সকলের গর্ভাবস্থা সমানভাবে সুখকর হবে না। কারও কারও জটিলতা থাকে—খাওয়া আর ঘুমের অসুবিধে। কারও কারও হয়তো শারীরিক অসুবিধে দেখা দেয় প্রকটভাবে। সব মিলিয়ে সবাই একই রকমভাবে গর্ভাবস্থা শুরু করে না। যাদের গর্ভাবস্থার শুরুতে বা পুরো গর্ভাবস্থা জুড়ে তেমন কোনো জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়নি, অনাগত সন্তানকে ঘিরে তাদের সকল স্বপ্নগুলো পরিকল্পনা-মাফিক এগোতে থাকে; কিন্তু গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই যাদের জটিলতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, সন্তানকে ঘিরে তাদের স্বপ্নগুলো সে-রকম গোছালোভাবে আগায় না। এতে করে অনেকে হতাশ হয়ে পড়েন আর ভাবেন—আমরা হয়তো গর্ভাকালীন সময়টা ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। আমাদের অনাগত সন্তানের জীবনের শুরুটা হয়তো সুন্দর হবে না। এই ধরনের চিন্তা যাদের মনে সর্বদা ঘুরপাক খায় তাদের বলি—হতাশ হবেন না। এখনো বেশি দেরি হয়নি।

আসলে, গর্ভাবস্থার নয় মাসের সময়টুকুই যে মাতৃত্বের সব এমনটা কিন্তু নয়। হতে পারে গর্ভকালীন সময়ে নানান জটিলতার কারণে আমরা খুব বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারিনি। জিকির-আজকার করা, মাসনুন দুআগুলো নিয়ম করে পড়া, হাদিস পড়া এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করতে হয়তো আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাই বলে কি আমাদের মাতৃত্ব ব্যর্থ হয়ে যাবে? কখনোই নয়। সংশোধনের রাস্তা যতক্ষণ অবধি খোলা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনোকিছুই দেরি নয়।

গর্ভের বাচ্চারা আদতে যৎসামান্যই শুনতে পায়; কিন্তু জন্মের পর তারা শুধু শোনেই না, দেখে এবং অনুধাবনও করে। সুতরাং গর্ভকালীন সময়টা বাচ্চাকে সঠিক জিনিস শোনানো যতটা জরুরি, তার চেয়েও বেশি জরুরি সেই সঠিক জিনিস গর্ভাবস্থার পরেও তাকে শুনিয়ে যাওয়া। বাচ্চার মূল তারবিয়ত তো শুরু হয় জন্মের পরেই।

সাধারণত দুই বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চারা খুব দ্রুত সবকিছু শিখে ফেলার অবস্থায় থাকে। এই সময় পর্যন্ত তাদের মস্তিষ্ক একেবারে খালি থাকে বিধায় নতুন যেকোনো কিছু তারা সহজে শিখতে পারে এবং স্মরণেও রাখতে পারে। এই সময়টায় আমরা তাদের কুরআনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। অনেক বাচ্চা এক বছর বয়সের মধ্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে। কেউ কেউ আরেকটু বাড়তি সময় নেয়। মোটামুটি দুই বছর বয়সের মধ্যে তারা ছোটো কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কিছু বাক্যও বলতে শিখে যায়। এই সময়টাতে আমরা তাদের আরবি অক্ষরগুলো শেখাতে পারি। হয়তো সবটা শিখতে পারবে না, কিন্তু দৈনন্দিন তাদের উচ্চারিত শব্দগুলোর তালিকায় যদি আরবি হরফগুলোও যুক্ত করি, খুব ছোটোবেলা থেকেই তাদের সাথে আল্লাহর কালামের ভাষার একটা সংযোগ তৈরি হবে, ইন শা আল্লাহ।

আরেকটা বিষয় বলে নেওয়া জরুরি—সন্তানের প্রথম শিক্ষক কিন্তু আমরাই। আমরা যদি ধরে নিই যে, সন্তানকে স্কুলে বা মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে যাবতীয় জিনিস শেখাব, তাহলে ভুল হবে। সন্তানের প্রাথমিক পাঠ তার ঘর থেকেই দিতে হবে। তাহলেই সে হয়ে উঠবে একজন আদর্শ মুসলিম। তাকে কুরআন কারিম শেখানো, কুরআন কারিমের সাথে তার সংযোগ স্থাপনের নিমিত্তে আমাদের অবশ্যই শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতে হবে। আমাদের অনেকের তিলাওয়াত শুদ্ধ না-ও থাকতে পারে। যারা শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে অপারগ, গর্ভাবস্থায় তারা নানান উপায়ে তাজউইদ শুদ্ধ করে নিতে পারে ইচ্ছা করলে। বাসায় কোনো উসতাজার অধীনে, অথবা অনলাইনের কোনো কোর্স থেকে কিংবা ইউটিউব টিউটোরিয়াল দেখে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনো উসতাজার

অধীনে অফলাইনে তাজউইদ শেখা যায়। শেখা আর জানার ব্যাপারে আমরা যতবেশি যত্নশীল হবো, আমাদের সন্তানদের শেখাটাও তত পরিচ্ছন্ন হবে, ইন শা আল্লাহ।

১২০ তম বড়ো দিনের গণনা

ইসলামি বিশ্বাস মতে, একজন ফেরেশতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশে মায়ের গর্ভে সন্তানের দেহের মধ্যে রুহ ফুঁকে দেন। রুহ ফুঁকে দেওয়ার এই দিনটি গর্ভবতী একজন মুসলিম নারীর জন্য নিঃসন্দেহে বিশেষ একটি দিন। একটা প্রাণের মধ্যে আরেকটা নতুন প্রাণের সঞ্চারণ!

গর্ভধারণ করার মোটামুটি সতেরো সপ্তাহ পর এই ১২০ তম দিনের আগমন ঘটে। এই সময়টাতেই বাচ্চার দেহে রুহ তথা প্রাণের সঞ্চারণ ঘটে বলে অনেকে বলে থাকেন। যে-সকল নারীর ঋতুচক্র আটাশ দিনের হয়, তাদের ক্ষেত্রে শেষ মাসিকের প্রথম দিন থেকে উনিশ সপ্তাহ পর গণনায় এই দিনটি আসে। যাদের সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘস্থায়ী ঋতুচক্র রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই গণনার কাজটি এত সহজে করা যায় না। আমাদের ডিম্ব স্ফূটনের সময়কাল থেকে এই হিসাবে বের করার চেষ্টা করতে হবে। তারপর ওইদিন থেকে ১২০ দিনের সময় গণনা করতে হবে।

ঋতুস্রাব হওয়ার বারো থেকে ষোলো দিন পর ডিম্ব স্ফূটনের প্রক্রিয়া ঘটে। সুতরাং আমরা যদি মিস হওয়া ঋতুস্রাবের তারিখ থেকে দুই সপ্তাহ পিছিয়ে গণনা করি তাহলে গর্ভধারণ করার সম্ভাব্য সঠিক সময় নির্ণয় করতে পারব। যদিও গর্ভধারণের সময়ের সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে-ই আছে।

ন্যায়পরায়ণ রুহের জন্য দুআ করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে চারটি নির্দেশনা সমেত একজন ফেরেশতা মায়ের গর্ভে আসে। সেই ফেরেশতাকে লিপিবদ্ধ করতে বলা হয় গর্ভের শিশুর আমল, তার রিজিক, তার হায়াত বা জীবনকাল এবং সে পাপী হবে, না পুণ্যবান। এ-সব লিপিবদ্ধ করে গর্ভের শিশুর দেহে রুহ ফুঁকে দেওয়া হয়।

গর্ভে থাকাবস্থাতেই একজন শিশুর জীবনকাল নির্ধারণ হয়ে যায়—কী হবে, কীভাবে হবে, কখন হবে ইত্যাদি। শুধু রুহই ফুঁকে দেওয়া হয় না, তার গলার সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তার ভাগ্যলিপিও। সে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, নাকি অভিশপ্তদের দলে শামিল হবে—তা ঠিক হয়ে যায় সে দুনিয়ার আলো দেখার বহু আগেই। বাবা-মা হিসেবে, আমরা নিশ্চয় এমন কোনো সন্তান আশা করব না যে ভালোবাসা নয়, দুনিয়াতে বরং আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে। তাই বাচ্চার দেহে রুহ সঞ্চারের সময়কালটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে অনেক বেশি দুআ করতে হবে এই সময়ে; যেন একজন উত্তম, ন্যায়পরায়ণ এবং আমলদার সন্তান তিনি আমাদের দান করেন। তার উত্তম গুণাবলি, আমল এবং ন্যায়পরায়ণতার কারণে যেন বিচার দিবসে সে-ও গৌরবান্বিত হতে পারে, বাবা-মা হিসেবে আমরাও যেন সেই গৌরবের ভাগিদার হতে পারি। দুআ ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই, যে মাধ্যমে এই আশাটুকু আল্লাহর কাছে করা যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'দুআ ছাড়া আর কিছুই তাকদির বদলাতে পারে না; আর নেক আমল ছাড়া আর কিছুই বয়সে বৃদ্ধি ঘটায় না।'[১]

আমাদের জন্য অত্যন্ত খুশির সংবাদ এই যে—সন্তানের জন্য যে দুআগুলো আমরা করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুব দ্রুতই সেই দুআগুলো কবুল করে নেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—কোনো রকম সন্দেহ ছাড়াই তিন ব্যক্তির দুআ কবুল করা হয়। মাজলুম তথা নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, মুসাফির বা সফরে আছে এমন ব্যক্তির দুআ এবং সন্তানের জন্য করা পিতা-মাতার দুআ।'[২]

তাই আমাদের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে উত্তম সন্তানের জন্য প্রাণ ভরে দুআ করা। দুনিয়াতে তারা যেন কল্যাণের কাজে নিয়োজিত থাকে। তারা যেন আমাদের চোখ শীতল করে, আখিরাতে যেন আমাদের নাজাতের উসিলা হয়।

জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছে উত্তম সন্তান চেয়ে দুআ করেছিলেন। শুধু তিনি বৃদ্ধ ছিলেন তা-ই নয়, তার স্ত্রীও ছিলেন গর্ভধারণে অক্ষম। তথাপি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতের ওপর থেকে তিনি নিরাশ হননি। তার দুআ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করেন এবং তাকে 'ইয়াহইয়া' নামে একজন পুত্রসন্তান দান করেন, যিনি পরে নবীও হয়েছিলেন। জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দুআটি কুরআন কারিমে এভাবে এসেছে—

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

ওখানেই জাকারিয়া নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলল—'আমার রব, আমাকে আপনার

[১] জামি তিরমিজি, হাদিস : ২১৪২
[২] তিরমিজি, হাদিস : ১৯০৫

পক্ষ থেকে একটি সুসন্তান দান করেন। আর নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।।[১]

আল্লাহর নবী ইবরাহিম আলাইহিস সালামও ছিলেন নিঃসন্তান। বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলেও তার কোলজুড়ে কোনো সন্তানাদি আসেনি। তিনিও আল্লাহর কাছে উত্তম সন্তানলাভের দুআ করেছিলেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই দুআ কবুল করে, তাকে দান করেন এক নেককার সন্তান, যার নাম ইসমাইল। তিনিও পরে আল্লাহর সম্মানিত নবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দুআটি কুরআনে এসেছে এভাবে—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

রব, আপনি আমাকে এক সৎকর্মশীল পুত্রসন্তান দান করেন।[২]

সন্তান শারীরিকভাবে ত্রুটিমুক্ত হবে কি না, তার স্বাস্থ্য কেমন হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমাদের পেরেশানি হতে দেখা যায়। তারা যেন সকল প্রকার রোগ, ত্রুটি এবং বিকলাঙ্গতা থেকে মুক্ত থাকে—সেই দুআ আমরা সর্বদা করি। আমরা যেভাবে সন্তানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি, একইভাবে সন্তানের রুহ তথা আত্মার ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন থাকাটাও জরুরি। সে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেই শুধু চলবে না, সে যেন একটা প্রশান্ত আত্মার অধিকারী হয়, যেন সে কল্যাণ আর রহমত নিয়ে আগমন করে, সে-জন্যেও আমাদের দুআ অব্যাহত রাখতে হবে। খুব সুন্দর আর সুঠাম স্বাস্থ্যের সন্তান, কিন্তু বড়ো হয়ে সে যদি ঈমানহারা হয়, কী লাভ হবে আমাদের তাতে? তাই সন্তানের জন্য শুধু শারীরিক সুস্থতার দুআই নয়, তার আত্মিক উৎকর্ষের জন্যেও অবিরাম দুআ করা জরুরি।

যেহেতু বাচ্চার রুহ বা আত্মার কল্যাণকামিতা চেয়ে আমরা এই সময়টায় দুআ করব, তাই দুআ কবুলের বিশেষ মুহূর্তগুলো যদি আমরা বেছে নিতে

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৮
[২] সূরা আস-সাফফাত, আয়াত : ১০০

পারি, সেটা অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে, ইন শা আল্লাহ। দুআ কবুলের জন্য রাতের শেষ তৃতীয়াংশের চাইতে উত্তম সময় আর হতেই পারে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

'প্রত্যেক রাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন—

> 'কোনো প্রার্থনাকারী আছ কি, যে আমার কাছে কিছু চাইবে? আমি তাকে তা দেবো। ক্ষমা চাওয়ার জন্য কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'[১]

আসমান-জমিনের রব নিজ অনুগ্রহে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন শুধু বান্দাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যেই! সুবহানাল্লাহ! আমাদের অনেকে রাতের শেষ ভাগে জেগে থাকি—প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে, ভুলে রান্নাঘরে রেখে আসা তরকারি ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে, অথবা কোনো কারণ ছাড়াই। আমরা ইচ্ছা করলে শেষ রাতের এই সময়টায় ওজু করে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে পারি। আল্লাহ তাআলার কাছে খুলে বলতে পারি যাবতীয় ইচ্ছা, স্বপ্ন আর আবদারের কথা। নিজের জন্য, অনাগত সন্তানের জন্য, পরিবার-পরিজন সকলের জন্য আমরা সুস্থতা, কল্যাণ আর সার্বিক সাফল্য চাইতে পারি। সচ্চরিত্র, তাকওয়াবান সন্তান লাভের চাইতে বড়ো স্বপ্ন গর্ভকালীন সময়ে আর কিছু হতে পারে না। আমরা সেই স্বপ্নের কথা আমাদের রবকে বেশি বেশি বলতে পারি। সর্বোপরি একটা সহজ এবং সুস্থ জন্মদান, নিজেদের সর্বোত্তম পিতা-মাতাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাউফিক চেয়ে পার করতে পারি শেষ রাতের এই বরকতময় মুহূর্তগুলো।

[১] সুনানুদ দারিমি, হাদিস : ১৫২১

অপেক্ষার শেষ দিনগুলো

শেষ প্রহরের ভাবনা

কত অযুত রাত্রি, নিযুত প্রহরের অপেক্ষা সন্তান জন্মদানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে ঘিরে। একটা তুলতুলে শরীর আমাদের কোলজুড়ে বিরাজ করবে। ছোটো ছোটো চোখ দিয়ে পিটপিট করে সবকিছু দেখবে সে। দীর্ঘ নয়মাসের পরিচিত জগৎ ছেড়ে নতুন এই জগতে চলে আসায় তার যেন বিস্ময়ের শেষ নেই। সেই বিস্ময়ের রেশ তার চোখেমুখে ফুটে উঠবে ভীষণভাবে।

আমরা এই দৃশ্যগুলো ভাবি আর অপেক্ষা করি তাকে কাছে পাওয়ার। নিঃসন্দেহে এটা এক মধুরতম অপেক্ষা! তবে, এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে আমাদের যেতে হবে এক চূড়ান্ত পরীক্ষার ভেতর দিয়ে। একটা সুস্থ আর স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে আমরা এই অনাবিল আনন্দের ভাগীদার হতে পারি।

কিন্তু, প্রসব জিনিসটা কেমন?

প্রসব জিনিসটার ব্যাখ্যা ঠিক লিখে লিখে বোঝানোটা আসলে খুবই মুশকিল একটা ব্যাপার। এই অভিজ্ঞতা এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে—একেকজন নারীর বেলাতে এই অভিজ্ঞতা একেক রকম হতে পারে। এমনকি, একই নারীর দুই সময়ের প্রসব-অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ দুই রকম হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তাই, নির্দিষ্ট করে প্রসব জিনিস ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই।

টিভি, ম্যাগাজিন অথবা আশেপাশের অনেক নারীর কাছে শুনে প্রসব অভিজ্ঞতাটাকে আমাদের কাছে ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হতে পারে। আদতে, এসব বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। নারীর শরীরকে আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তাআলা সন্তান ধারণের, তাকে জন্মদানের উপযোগী করেই তৈরি করেছেন। সুতরাং, প্রসব জিনিসটাকে যারা খুব ভয়ানকভাবে উপস্থাপন করেন, তারা মূলত নারীর এই ফিতরাতকেই অস্বীকার করেন। অনেক মা-ই সাক্ষ্য দেবেন যে—সন্তান জন্মদানের দিনটি তাদের জীবনে ছিল সবচেয়ে আনন্দময়, আবেগঘন এবং বিস্ময়কর দিনগুলোর একটি। একটি শিশুকে জন্ম দেওয়াটা নারীর অসাধ্য কিছু নয়। আর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো কুরআনে বলেছেনই যে—সাধ্যের বাইরে তিনি বান্দার ওপরে কিছু চাপান না। তিনি বলেছেন—

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেহেতু বান্দার ওপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপান না, তাহলে কেন আমরা ধরে নিচ্ছি যে, প্রসব জিনিসটা ভয়ানক কোনো অভিজ্ঞতা? কেন বিশ্বাস করছি যে এই সময়টা অতিক্রম করা আমার জন্য কঠিন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য সহজ করবেন নিশ্চয়। ইন শা আল্লাহ। তাওয়াক্কুল শুধু তাঁর ওপরেই।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

জন্ম-পরিকল্পনা

প্রতিটা বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখতে পারা বেশ চমৎকার একটা গুণ। ব্যক্তি হিসেবে আপনি কতটা গোছালো, কতটা ধী-শক্তি-সম্পন্ন এবং বাস্তবমুখী এই গুণ সেটা প্রমাণ করে। বাচ্চা জন্মদানের বেলাতেও আমাদের সামনে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা চাই।

যেদিন বাচ্চা জন্ম নেবে, সে-দিনই যদি আপনাকে ঠিক করতে হয় কোন হাসপাতালে যাবেন, কোন ডাক্তার বা ধাত্রী আপনাকে দেখবে, কোন যানবাহনে চড়ে যাওয়া হবে—তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার সামনে প্রসবের দিনের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। এই না থাকাটা অনেক সময় ভোগান্তির কারণ হতে পারে। যদি কোনো বিষয়ে আমাদের তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেই সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময় ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ধরেন, প্রসব-বেদনা ওঠায় আপনাকে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে। আপনার স্বামী বা অভিভাবকদের কেউ রাস্তায় এসে কোনো যানবাহন পাচ্ছেন না। অনেক কষ্টেসৃষ্টে একটা সিএনজি তারা জোগাড় করে আনলেন। সেই সিএনজিতে চড়ে আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। হাসপাতালের ডাক্তার চেক-আপের পর যদি বলে, সিএনজিতে করে আসাটা আজ মোটেও উচিত হয়নি, রাস্তায় গাড়ির ঝাঁকুনির কারণে বাচ্চা অথবা আপনার খানিকটা সমস্যা তৈরি হয়েছে, ব্যাপারটা কেমন হবে তখন?

অথবা ধরেন, হাসপাতালে আসার আগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অথবা নির্দিষ্ট ডাক্তারের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ করলেন না। এসে শুনলেন, যে ডাক্তারকে আপনারা দেখাতে চান সেই ডাক্তার উপস্থিত নেই। তার বাসা

দূরে, আসতে বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে। প্রসব-বেদনা নিয়ে এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা কষ্টের হবে না?

অথচ, যদি আপনারা আগে থেকেই একটা বা দুইটা গাড়ির ড্রাইভারের সাথে আলাপ করে রাখতেন, প্রসব-যন্ত্রণা উঠলে আপনাদের গাড়ি তালাশ করার যন্ত্রণাটাও বাড়তি করে নিতে হতো না এবং সিএনজিতে চড়ার কারণে বাচ্চা অথবা মায়ের কোনো ধরনের ক্ষতিও হতো না। বাসা থেকে বের হওয়ার আধ ঘণ্টা বা একঘণ্টা আগে যদি ডাক্তার অথবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রাখা হতো, হাসপাতালে এসে আর সময়ক্ষেপণ করার দরকার পড়ত না। সঠিক আর সুন্দর পরিকল্পনা থাকার এই হলো সুবিধা আর অসুবিধা।

আমরা বুঝতে পারলাম—একটা গোছানো আর বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা আমাদের প্রসবের দিনকে আরও গুছিয়ে সুন্দর করে তুলতে পারে। তাই আমাদের স্বামী কিংবা অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করে আমরা ঠিক করে রাখব কী কী কাজ করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, কার দ্বারা করতে হবে ইত্যাদি। সম্ভব হলে খাতায় লিখে রাখব সেগুলো।

বাচ্চার জন্মদানের পর আমাদের ওয়ার্ডে রাখা হবে না কেবিনে, যদি ওয়ার্ডে রাখা হয় সেক্ষেত্রে কীভাবে আমরা পর্দার লঙ্ঘন এড়াতে পারি, কীভাবে সেখানে আসা গাইরে মাহরাম পুরুষ অথবা ডিউটিতে আসা পুরুষ ডাক্তারের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারি সে-সবও আমাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। যে হাসপাতালে বাচ্চার জন্ম হবে, সেখানে হালাল খাবার-দাবার পাওয়া যায় কি না, যদি না পাওয়া যায় কী করতে হবে? জন্মের পরপর বাচ্চার মুখে মধু দিতে হয়, তার কানে আজান দিতে হয়। এসব কে করবে—তা ঠিক করে রাখা যায়। বাচ্চা জন্মদানকালে আমাদের সাথে কে থাকবে? বাচ্চার তোয়ালে, আমাদের কোন কোন কাপড়চোপড় সাথে নিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আগেভাগেই পরিকল্পনা সাজিয়ে রাখতে পারি।

একটা জিনিস স্মরণে রাখতে হবে যে, সর্বদা সবকিছু পরিকল্পনা-মাফিক না-ও হতে পারে। হতে পারে যে ডাক্তার আমাদের দেখার কথা তার কোনো বিপদ হলো বা তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আমরা কী করব? এ-রকম মুহূর্তে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই অবস্থায় আমরা ঘাবড়াব না একদম। এ-সবের জন্যেও মানসিক প্রস্তুতি রাখব। সর্বদা মনে রাখব— দিনশেষে সব কিছু সেভাবেই হবে, যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইবেন। এই তাওয়াক্কুল অন্তরে রেখে আমরা আমাদের পদক্ষেপগুলো সাজিয়ে নেব, ইন শা আল্লাহ।

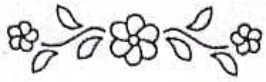

গৃহজন্ম

নিজের ঘরে সন্তান প্রসবের বিষয়টা আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত নিয়ম এবং এটা আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যও। তবে আজকাল, গৃহজন্ম নিয়েও মিশ্র অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। অনেকের কাছে হাসপাতালে বাচ্চা প্রসবের বিষয়টা স্বস্তির ঠেকে না। ডাক্তার, আয়া, নার্স আর রোগিদের ছুটোছুটি-হুটোপুটি এবং অন্য নারীদের প্রসববেদনা নিজ চোখে দেখতে পাওয়াটা সবিশেষ স্বস্তির বিষয় নয় যদিও। তাছাড়া হাসপাতালে নিজের আব্রু রক্ষা করে চলা, যথোপযুক্তভাবে পর্দা করতে পারা ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারেও শঙ্কা থেকে যায়। এ-কারণে অনেক নারীরা নিজের ঘরে সন্তান জন্ম দেওয়াকে স্বস্তির এবং আনন্দের মনে করেন।

আবার বিপরীত দিকের মতামতও আছে।। অনেকের কাছে ঘরে সন্তান জন্ম দেওয়াটাই ভয়ের বিষয়। অভিজ্ঞ ধাত্রীর অভাব থাকা, প্রসব-পরবর্তী কাজগুলো ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারার মতো অভিজ্ঞতা না থাকা এবং সর্বোপরি ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের কাছে নির্ভয় হয়ে ওঠার কারণে ঘরের চাইতে হাসপাতালে সন্তান জন্মদান অনেকে পছন্দ করে থাকেন।

নিজের ঘরে সন্তান জন্মদানের কাজটা সম্পন্ন করা গেলে অবশ্যই ভালো। এতে করে নারীর পর্দা, আব্রু ইত্যাদির কোনো অসুবিধে হবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে, জন্মদানকালে যারা কাছাকাছি থাকবেন, ধাত্রী থেকে শুরু করে আরও যারা থাকেন, তারা যেন এসব কাজে সবিশেষ অভিজ্ঞ হন। প্রসব-কালীন কোনো জটিলতা দেখা দিলে যেন দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা যায়—সেই বিষয়টাও নিশ্চিত করতে হবে। প্রসবকালের

আগে রেগুলার চেক-আপে যদি ডাক্তার ঘরে জন্মদানের বিষয়টায় অনুৎসাহিত করেন, সেই পরামর্শও আমাদের শুনতে হবে। মনে রাখা দরকার—প্রসবের সময়টা কোনো ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করার সময় নয়। এ সময় কোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। সামান্য একটু হেলাফেলা শঙ্কায় ফেলে দিতে পারে দুটো জীবনকেই।

সাধারণত দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের পরে নারীরা নিজের ঘরে সন্তান জন্মদানের ব্যাপারে বেশি উৎসাহ পেয়ে থাকেন। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা থেকেই তারা এই সাহসটুকু সঞ্চার করেন নিজের ভেতর। প্রথমবার বাড়িতে জন্মদান সম্ভব না হলেও, দ্বিতীয়বারে আমরা এটাকে ভালোভাবে বিবেচনায় রাখতে পারি, ইন শা আল্লাহ। তবে সেটা অবশ্যই প্রাকৃতিকভাবে (নরমাল ডেলিভারি) জন্মদানের ক্ষেত্রে। এপিডুরালের (সি সেকশান/সিজার) ক্ষেত্রে অবশ্যই হাসপাতালে যেতে হবে।

আরও কিছু প্রস্তুতি

সব কাজের জন্যই আমাদের প্রস্তুতি দরকার। যেই কাজ যতটুকু প্রস্তুতি নিয়ে করা হয়, সেই কাজটি ততটুকু ভালো হয়। এ-জন্য প্রসব বা সন্তান জন্মদানের নির্দিষ্ট দিনটির জন্যেও আমাদের যথাযথ প্রস্তুতি থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সব কিছু গুছিয়ে নেওয়া, নিজের কাপড়-চোপড়, বাচ্চার কাপড়-চোপড়—সব কিছু মনে করে করে গোছগাছ করে রাখা অত্যন্ত জরুরি। জন্মদানের ঠিক আগে আগে এ-সব করার মতো পর্যাপ্ত মানসিক অবস্থা অথবা সুযোগ না-ও থাকতে পারে। আর তাছাড়া, তাড়াহুড়ো করে করতে গেলে কিছু কিছু জিনিস বাদ পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনাও থেকে যায়। গুছিয়ে রাখলে দরকারের সময়ে সেগুলো হাতের কাছে পাওয়া যাবে এবং কোথাও কোনো রকম বিঘ্ন ঘটবে না। কী কী জিনিস গোছাতে হবে—তা আমরা নিজেরা ঠিক করে নিতে পারি। দরকারে স্বামী অথবা অভিজ্ঞ অভিভাবক কিংবা ধাত্রীর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করে নেওয়া যায়। আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমরা তো গুছিয়ে নেবই, পাশাপাশি এগুলোও আমরা সাথে করে নিয়ে যেতে পারি—

কুরআন কারিম

প্রসবকালীন সময়ে অনেকে কুরআন কারিম তিলাওয়াত শুনতে চায়। সন্তান দুনিয়াতে আসা মাত্রই কুরআন কারিমের সুর তার কানে পৌঁছাবে—এই দৃশ্যটাই অনেক চমকপ্রদ! তাছাড়া, প্রসবকালীন সময়ে তিলাওয়াতের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা গেলে, সেটা একপ্রকার ব্যথা নিরাময় হিসেবেও কাজ করতে পারে। প্রসবোত্তর রক্তপাতের কারণে আমরা হয়তো

কুরআন স্পর্শ বা তিলাওয়াত করতে পারব না, কিন্তু তিলাওয়াত শুনতে কোনো বাঁধা নেই। তবে যেখানে আমরা অপারেশান বা ডেলিভারির জন্যে যাব, সেখানে কুরআন কারিম তিলাওয়াত শোনার পরিবেশ আছে কি না, নিশ্চিত হতে হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করা যেতে পারে বিষয়টা নিয়ে। তবে বেশিরভাগ হাসপাতালে বলা হয়, গর্ভবতী নারীরাই যেন নিজ নিজ টেপ/সিডি প্লেয়ার নিয়ে সাথে আসেন তিলাওয়াতের। হাসপাতাল থেকে অনুমতি পাওয়া গেলে আমরা তিলাওয়াত শোনার একটা ডিভাইস সাথে করে নিয়ে যেতে পারি, ইন শা আল্লাহ।

দুআর বই বা সংকলন

প্রসবকালীন সময়ে যে দুআগুলো আমরা পড়তে চাই, সেগুলো একটা কাগজে লিখে আনা যেতে পারে। মনে করে করে পড়ার চাইতে, কাগজ থেকে দেখে দেখে পড়াটা উক্ত সময়ের জন্য বেশি সুবিধাজনক। তাছাড়া, প্রসবকালীন সময়ে আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে থাকি, যে অবস্থায় আমাদের দুআগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। তাই, এই দিকটা বিবেচনা করে অনেকে হয়তো আমাদের কাছে তাদের নিজেদের জন্য দুআ চাইতে পারে। আমরা সেই দুআর অনুরোধগুলোও একটা কাগজে লিখে সাথে নিয়ে যেতে পারি এবং সেই তালিকা দেখে দেখে দেখে তাদের জন্যেও দুআ করতে পারি।

নামাজের সরঞ্জামাদি

প্রসবের আগের সময়টায় আমাদের ফরজ সালাতগুলো আদায় করতে হবে। এতে উদাসীন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই আমরা একটা মুসল্লা, সালাত আদায়ের যদি নির্দিষ্ট কোনো পোশাক থাকে সেটা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও সাথে নিতে পারি। হাসপাতালে আমাদের সহযোগী হিসেবে যে অভিভাবক থাকবেন, তারও এসব দরকারে লাগতে পারে।

প্রয়োজনীয় পোশাক

জন্মদানের জন্য পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আরামদায়ক, সহজেই নামানো/উঠানো যায় এমন ট্রাউজার বা স্কার্ট অবশ্যই নিতে হবে। এগুলোর সাথে মিলিয়ে পরে নেওয়া যায়—এমন লম্বা ও সামনের দিকে খোলা যায়, এমন টপ নিতে হবে, যেটা হাঁটুর নিচ অবধি ঢেকে রাখবে। কারণ, কখনো যদি আমরা ট্রাউজার বিহীন অবস্থায় থাকি, তাহলে এটা পড়লে আমাদের সমস্ত শরীর ভালোভাবে ঢেকে থাকবে। সামনের দিকে খোলা যায়, এমন টপ পরতে পারলে বাচ্চাকে স্তন্যপান করাতে সুবিধা হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের আবরণমোচন হলেও তা যৎসামান্যই হবে।

মিসওয়াক

গর্ভবতী নারীর মাড়ি সংবেদনশীল, স্ফীত ও এবং মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ার পেছনে হরমোনের মাত্রা ও বর্ধিত রক্ত সরবরাহের সম্মিলিত প্রভাব রয়েছে। কাজেই বিশেষভাবে একজন গর্ভবতী নারীকে প্রতিদিন মিসওয়াক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায়ও।

গর্ভাবস্থার পুরোটা সময় জুড়ে এমনকি প্রাক-গর্ভকালীন সময়ের বহু পূর্ব থেকেই আমরা হয়তো মিসওয়াকের ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছি। কারণ, গর্ভাকালীন সময়ে মাড়ি ও দাঁতে সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই প্রচলিত একটি ব্যাপার এবং টুথপেস্ট ব্যবহারের দরুন গর্ভবতী নারীরা অসুস্থ অনুভব করতে পারেন। টুথব্রাশ দিয়ে টুথপেস্ট ব্যবহারের চেয়ে মিসওয়াক ব্যবহার করা অনেক বেশি সহজতর এবং বিশেষ করে প্রসবের সময় এটি অনেক বেশি উপকারী। বিভিন্ন সময়ে আমরা মিসওয়াক ব্যবহার করতে পারি, যেমন—অসুস্থ থাকার পর মুহূর্তে, প্রসবের উন্নীত পর্যায়গুলোতে ঘুম ঘুম ভাব কাটিয়ে জেগে থাকার প্রয়াসে (হ্যাঁ, এটা হতে

পারে!), কুরআন তিলাওয়াত কিংবা সালাত আদায়ের পূর্বে, অথবা কেবল কিছু চাবানোর উদ্দেশ্য! আমাদের সদ্যোজাত শিশুর সাথে ব্যস্ত সময় পার করার মুহূর্তেও মিসওয়াক হতে পারে আমাদের সঙ্গী এবং এমনকি স্তন্যপান করানোর সময়ও এটি ব্যবহারের উপযোগী।

খেজুর

কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي
مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا - فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا
أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا - وَهُزِّي إِلَيْكِ
بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

সন্তান প্রসবের বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষতলের দিকে তাড়িত করল। সে বলে উঠল—'হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম আর (মানুষের) স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে যেতাম!

নিম্নদিক থেকে তাকে ডাক দেওয়া হলো—'তুমি দুঃখ করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার পাদদেশ দিয়ে এক নির্ঝরিণী প্রবাহিত করে দিয়েছেন।

খেজুরগাছের কাণ্ড ধরে তুমি তোমার দিকে নাড়া দাও, তা তোমার ওপর তাজা পরিপক্ক খেজুর পতিত করবে।[১]

ঈসা আলাইহিস সালামকে জন্ম দেওয়ার আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মারইয়াম আলাইহাস সালামকে খেজুর খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খেজুর খাওয়ার

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত ২৩-২৫

পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের। খেজুর যে সবিশেষ উপকারী ফল সে-সম্পর্কেও আমরা কম-বেশি ওয়াকিবহাল। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালীন সময়ে, প্রসব-বেদনায় এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে খেজুর স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। গবেষণায় জানা গেছে, খেজুরে এমন এক ধরনের উদ্দীপক বস্তু আছে—যা গর্ভকালীন শেষ কয়েক মাসে জরায়ুর পেশিসমূহকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। এ-ছাড়াও প্রসব প্রক্রিয়াকে সক্রিয় এবং সহজ করতেও খেজুর ভূমিকা রাখে। খেজুর এমন একটি ফল—যা শরীরে দ্রুত শক্তির যোগান দেয়। শেষ ত্রৈমাসিক ও প্রসবকালীন সময়ে তাই খেজুর হতে পারে আমাদের জন্য 'সুপার ফুড।'

প্রসব পরবর্তী অবস্থায়ও খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ, প্রসূতি মায়ের জন্য খেজুর সাধারণত বলবর্ধক এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন খাদ্য, যার নির্দিষ্ট উপকারিতা রয়েছে। খেজুরে পটাশিয়াম, গ্লাইসিন ও থ্রেওনিন রয়েছে; যা প্রোল্যাকটিন হরমোনকে সক্রিয় করে। খেজুর একটি আদর্শ খাবার হিসেবে সমাদৃত যার পুষ্টিগুণ অত্যন্ত বেশি।

জমজম

জমজমের পানির অসাধারণ গুণ রয়েছে। এই পানি পান করার পূর্বে যে দুআই করা হয়, অথবা যে নিয়তেই এই পানি পান করা হয়, সেই ইচ্ছা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূরণ করেন। আমাদের সন্তান প্রসবটা যেন সহজ হয়, প্রসবের ব্যথাটা যেন আমরা ধৈর্যের সাথে সহ্য করে যেতে পারি, মানসিকভাবে যেন আমরা শক্ত থাকতে পারি ইত্যাদি নিয়তে প্রসবের আগে পরে আমরা জমজম পান করতে পারি।

সন্তান প্রসবের সপ্তাহখানেক আগে নির্দিষ্ট পরিষ্কার বোতলে আমরা জমজমের পানি ভরে নিতে পারি। জমজমের পানি কত আগের সেটা খুব বিবেচ্য নয়; কারণ, এর আশ্চর্য গুণমানের দরুন লম্বা সময় পরে পান করলেও এই পানির স্বাদে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না। কাবা চত্বরে

দাঁড়িয়ে পান করার সময় যে স্বাদ পাওয়া যেত, সেই একই স্বাদ প্রায় অটুট থাকে।

জন্মদানের সহযোগী

অধিকাংশ নারীই আশা করেন যে, প্রসবকালীন সময়ে যেন আপন কেউ তার পাশে থাকে। এই চাওয়াটা অযৌক্তিক কিংবা অমূলক নয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—প্রসবকালীন সময়ে যদি অন্যদের কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে এই সমর্থন ব্যথা উপশমকারী ইনজেকশান বা ওষুধের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। সি-সেকশান প্রসবের সম্ভাবনা কমিয়ে আনে এবং মা ও শিশু উভয়ের জন্যই তা উপকারী হিসেবে ধরা দেয়।

আমরা প্রত্যাশা করি—প্রসবের সময়ে মা, বোন অথবা স্বামী আমাদের মাথার কাছে থাকবে। হাসপাতালে ডাক্তার আর নার্সের পাশাপাশি গর্ভবতী নারীকে মানসিকভাবে শক্ত রাখতে এ-ধরনের কারও উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তাকে নাকচ করা যায় না। কিন্তু কথা হচ্ছে—বাচ্চা জন্মদানের সময়ে বাবার উপস্থিতি কতটা যুক্তিসম্মত আর দরকারি?

প্রথমত, প্রসবকালীন সময়ে পুরুষের সংশ্লিষ্টতা সুন্নাহ-সম্মত নয়। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ছয় সন্তান জন্মদানের সময়ে তার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি উপস্থিত ছিলেন না। সালমা নামের একজন ধাত্রী সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। তিনি ছাড়াও, আরও কিছু নারীকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডেকে পাঠাতেন যাতে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রসবকালীন কোনো বিঘ্ন না ঘটে। একই কাজ খলিফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনেও দেখা যায়। একরাতে মদিনার বাইরে থাকা একটা তাঁবুর কাছে এলেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু। এসে দেখেন তাঁবুর প্রবেশমুখে একজন লোক বসা। তাঁবুর ভেতর থেকে একজন নারীর করুণ আওয়াজ ভেসে আসছিল। উমার জানতে চাইলেন ঘটনার

বিস্তারিত। লোকটা বললেন—তার স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়েছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো সে বাচ্চা প্রসব করতে যাচ্ছে।। এই কথা শুনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে এলেন এবং স্ত্রী উম্মু কুলসুমকে সাথে নিয়ে এলেন। স্ত্রীকে তাঁবুর ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন প্রসববেদনায় কাতর নারীকে সাহায্য করার জন্যে। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওই লোক তাঁবুর বাইরে অবস্থান করেন তখন। শুধু বসেই ছিলেন না, ঘরের লোকদের জন্য তারা দুজনে খাবার তৈরির কাজে লেগে পড়েন। খানিক বাদে তাঁবুর ভেতর থেকে উমারের স্ত্রী উম্মু কুলসুম জোরে বলে উঠলেন—

> 'আমিরুল মুমিমিন, আপনার বন্ধুকে সুসংবাদ জানান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে একজন পুত্রসন্তান দান করেছেন।'

এই ঘটনা থেকে আমরা কিন্তু অনেককিছুই শিখতে পারি। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কিন্তু লোকটাকে তাঁবুর ভেতরে ফিরে যেতে বলেননি; বরং তিনি নিজের স্ত্রীকে ডেকে এনে প্রসববেদনায় কাতর নারীর সেবায় নিয়োজিত করেছেন। প্রসবকালীন সময়ে একজন নারীর সেবায় আরেকজন নারীকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন।

এই ঘটনায় আরও একটা জিনিস আছে লক্ষ্য করার মতো। তাঁবুতে থাকা লোকটি এবং তার স্ত্রী কিন্তু মদিনার কেউ নয়। তারা ছিল মুসাফির। কোথাও সফর করছিল। পথিমধ্যে বিশ্রামের দরকার হলে তারা সেখানে তাঁবু টানায়। তাদের দুজনের কেউ কিন্তু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার স্ত্রী উম্মু কুলসুমকে চিনত না। সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়ার পরেও, সেই আগন্তুকের স্ত্রীর কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি প্রসবকালীন সময়ে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীর সাহায্য নিতে। এটা থেকে প্রমাণ হয়—প্রসবকালীন সময়ে গর্ভবতী নারীর পাশে যে সর্বদা নিজের মা, বোন বা দাদী অথবা নানীকেই থাকতে হবে তা কিন্তু নয়। অভিজ্ঞ এবং যত্নশীল কেউ হলেই যথেষ্ট।

প্রসবকালীন সময়েও একজন প্রসূতি নারী যেমন নিজের পর্দা, আব্রু ইত্যাদির খেয়াল রাখবে, ঠিক একইভাবে তার প্রসবকাজে সহায়তাকারী নারীদের পর্দা এবং আব্রু যাতে লঙ্ঘন না হয়, সেদিকটা খেয়াল রাখাও জরুরি। প্রসবকক্ষে প্রসূতির সাথে নারী ডাক্তার বা নার্স অথবা ধাত্রীরা থাকেন। একই কক্ষে যদি প্রসূতির স্বামীও উপস্থিত থাকেন, তাহলে পর্দা আর আব্রুর মর্যাদা নষ্ট হতে বাধ্য। তারওপর, স্বামীদের দৃষ্টি হিফাজতেরও তো একটা বিষয় আছে। পুরুষের জন্য দৃষ্টির হিফাজত করা ফরজ। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে প্রসবকক্ষে স্বামীদের উপস্থিতি কতটা যৌক্তিক বা আদৌ উচিত কি না—তা ভেবে দেখা জরুরি।

আমাদের সংস্কৃতিতেও প্রসবকক্ষে পুরুষদের (যারা পুরুষ ডাক্তার দিয়ে জন্মদান প্রক্রিয়া করায় তাদের কথা বাদে) প্রবেশাধিকার কখনো ছিল না এবং এখনো নেই। আমাদের মা, বোন, দাদি, নানি অথবা পরিচিত নারীদের উপস্থিতির মাধ্যমেই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। আর তাছাড়া, প্রসবকালীন সময়ে স্বামীর উপস্থিতি যে আলাদা কোনো উপকারিতা বয়ে আনে—তা-ও নয়। সুতরাং বাচ্চা প্রসবকালে আমরা আমাদের ঘনিষ্ঠ, পরিচিত নারীদের উপস্থিতি প্রত্যাশা করতে পারি। সে-রকম কাউকে পাওয়া না গেলে অভিজ্ঞ ধাত্রী অথবা হাসপাতালের মহিলা ডাক্তার আর নার্সই যথেষ্ট আমাদের এই যাত্রায় সবরকম সহায়তা প্রদানের জন্য, ইন শা আল্লাহ।

ই.ডি.ডি

Estimated Date of Delivery বা ই.ডি.ডি একটা মেডিকেলীয় টার্ম যা সন্তান জন্মের সম্ভাব্য দিন নির্দেশ করে। গর্ভধারণের পর যতবার আমরা আলট্রাসনোগ্রাফি করিয়েছি, ততবার রিপোর্টে এই ইডিডির একটা তারিখ আমরা দেখেছি। এই দিনটাকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবে আমাদের অনেক উত্তেজনা কাজ করে। আমাদের স্বপ্নের সন্তান দিনটাতে আমাদের কোল আলো করে আসবে, তার কান্নায় ভরে উঠবে চারপাশ। শুধু আমাদেরই নয়, পরিবারের সকলের মাঝেই দিনটাকে ঘিরে একটা উৎসব অনুভূতি কাজ করে।

তবে, গবেষণা জানাচ্ছে, কেবলমাত্র চার শতাংশ বাচ্চাই এই ইডিডিতে অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত দিনে জন্মগ্রহণ করে থাকে। কেউ কেউ নির্ধারিত দিনের কিছু আগে, কেউ কেউ বেশ আগে আবার কেউ কেউ নির্ধারিত দিনের পরে গিয়ে বাচ্চা প্রসব করে থাকে। এই ইডিডি নির্ধারিত হয় নারীর শারীরবৃত্তীয় কিছু কার্যকারণ সামনে রেখে; যেমন—ঋতুচক্রের সময়কাল, ঋতুচক্রের মাঝপথে ডিমের নিষেক, গর্ভধারণের আগের গর্ভপাত, চাপ, উদ্বেগ ইত্যাদি। সুতরাং, এইসব 'পূর্বনির্ধারিত দিন' বা 'ইডিডি' যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল হবে, তা কিন্তু নয়। এই দিনটাকে ঘিরে আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করব ঠিক আছে, কিন্তু বাচ্চা যদি এই দিনের আগে জন্মগ্রহণ করে, তাতে চিন্তিত হয়ে পড়া যাবে না। আবার, এই দিন পার হয়ে যাওয়ার পরেও প্রসববেদনা অনুভূত না হলে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। বাচ্চা ঠিক সময়েই জন্ম নেবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেদিন চাইবেন ঠিক সেদিনই জন্ম নেবে। এর একমুহূর্তও ব্যত্যয় ঘটবে না। তবে হ্যাঁ, সতর্কতার জন্যে আমরা সর্বদা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারি। যদি কোথাও

কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয়, তাদের কাছে সমস্তটা খোলাখুলি আলাপ করা উচিত। তারা যে নির্দেশনা দেবেন সেটা মেনে নেওয়াই উত্তম হবে তখন।

মোদ্দাকথা, ইডিডি বা পূর্বনির্ধারিত দিন যেন আমাদের বাড়তি কোনো পেরেশানির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সেই দিকটাতে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রসবের সময়ে দুআ

'দুআ'র বিষয়টি এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি। বইয়ের এই পর্যায়ে এসে আবারও দুআর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার তাগাদা অনুভব করছি। কারণ, প্রসবকাল যত ঘনিয়ে আসে, দুআ কবুলের সম্ভাবনা তত বেড়ে যায়। এই সময়ে আমাদের অনেক দুআ খুব দ্রুত কবুল হয়ে যায়—যা সচরাচর আগে ঘটত না। নিজের জন্য অবিরাম দুআ করার জন্য প্রসব-নিকটবর্তী সময়টা অত্যন্ত যুঁতসই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা বেশি বেশি দুআ করব যাতে তিনি আমাদের অনাগত সন্তানের দুনিয়ায় আগমনের বিষয়টা সহজ করে দেন। তাঁর কাছে অসাধ্য আর অসম্ভব কিছু নেই। সমস্ত সমাধানের উৎস তিনিই। তিনি চাইলেই বিষয়াদি সহজ হয়। তিনি ইচ্ছা করলেই যে-কোনো বিষয় কঠিন করতে পারেন। প্রসব-নিকটবর্তী সময়টা যেহেতু দুআ কবুলের সুবর্ণ সময়, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা একটা সহজ জন্মদান, মুত্তাকি এবং মুখলিস সন্তান এবং উত্তম পিতামাতা হয়ে ওঠার জন্য দুআ করা জারি রাখতে পারি।

ফেরশতাদের দুআ

যেহেতু এই সময়ে করা দুআগুলো কবুল হয়ে থাকে, তাই শুধু নিজের জন্যই নয়, আমাদের পরিবার, বাবা-মা, স্বামী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধব সকলের জন্যই আমরা আল্লাহর কাছে কল্যাণ চাইতে পারি। আমাদের পরিচিত যদি কোনো গর্ভবতী নারী থাকে, তার জন্যেও আলাদাভাবে দুআ করতে ভুলব না। এই দুআর একটা সরাসরি প্রভাব আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা

জানতে পারি—'কোনো বান্দা যখন অন্য এক বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে কিছু চায়, তখন তার দুআ শুনে ফেরেশতারা বলে ওঠেন—

> 'আল্লাহ, (সে অন্যের জন্য যা চাচ্ছে তা) তার জন্যেও কবুল করে নেন।'

ফেরশতাদের দুআ কখনো বিফলে যায় না। আমরা যখন আল্লাহকে বলব—'আল্লাহ, অমুকও আমার মতো গর্ভবতী। আর দিনকয়েক বাদে তার সন্তানও দুনিয়াতে আসার সময় হবে। তার জন্যে আপনি সন্তান জন্মদানকে সহজ করে দেবেন। তাকে নেককার সন্তান দান করবেন, যে সন্তান তার চোখের শীতলতা হবে। তাদের উত্তম বাবা-মা হয়ে ওঠার তাউফিক দেন।'

আমাদের এই দুআগুলো শুনে ফেরেশতারা যখন বলবে—'আল্লাহ, সে অন্যের জন্য যা আপনার কাছে চাইছে, তা তার জন্যেও কবুল করে নেন।' তখন কিন্তু আমরা আসলে ফেরেশতাদের দিয়ে আমাদের প্রয়োজনটুকুই আল্লাহর কাছে চেয়ে নিচ্ছি। কী চমৎকার বিষয়, তাই না? নিজেদের জন্য করা দুআগুলো কবুল হবে কি হবে না—তা নিয়ে সংশয় থাকতেই পারে; কিন্তু ফেরেশতাদের দুআ যে অবশ্যই কবুল হবে, সেটা শতভাগ নিশ্চিত।

সুতরাং, যদি আমরা চাই যে ফেরেশতারা আমাদের জন্য দুআ করুক, তাহলে অন্যের জন্য আমাদের বেশি বেশি দুআ করতে হবে।

কঠিন সময়ের সালাত

সালাত হলো মুমিনের জীবনে অক্সিজেন গ্রহণ করার মতো বিষয়। অক্সিজেন গ্রহণ না করলে মানুষের দেহ যেমন অসাড় হয়ে পড়বে, সালাত ছেড়ে দিলেও সেভাবে আমাদের অন্তর অসাড় হয়ে পড়ে। প্রসব-নিকটবর্তী সময়ে এবং প্রসবের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলেও অনেক নারীই সালাত ছেড়ে দেন। সময় আর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাজা করে নেওয়ার কথা ভেবে সালাত আদায় থেকে বিরত হয়ে পড়েন। এটা ভুল, ভুল এবং ভুল। যতক্ষণ আমাদের জ্ঞান আছে, যতক্ষণ আমরা পবিত্র আছি বা পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ সামনে আছে, ততক্ষণ সালাত ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের সামনে নেই। যুদ্ধের ময়দানে সামনের সারিতে থাকলেও সালাত ছাড়া যায় না। প্রসবের পূর্বমুহূর্তে তাহলে কীসের ছাড়!

এটা বাড়াবাড়ি নয়, বরং এটাই নিয়ম এবং কর্তব্য। যার সাহায্য আর দয়া আমাদের খুব করে দরকার, প্রসবের ঠিক আগে তাকেই যদি আমরা ভুলে যাই, কীভাবে হবে তাহলে?

অনেকে ভাবেন—প্রসবের আগমুহূর্তে বা গর্ভকালীন সময়ের শেষ দিকটায় সালাত আদায় যেহেতু কষ্টসাধ্য, তাই সালাত কাজা করে সেগুলো পরে পুরা করে নেওয়া যাবে। এই চিন্তাটা একেবারেই ভুল। মূলত, কঠিন সময়েও আমাদের সালাত আদায় করতে হবে এবং সেটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সহজ করে দিয়েছেন। দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে আমাদের জন্য বসে আদায় করার সুযোগ আছে। বসে আদায় করতে না পারলে শুয়ে শুয়েও সালাত আদায় করার সুযোগ রাখা হয়েছে। সুতরাং, 'দাঁড়িয়ে রুকু-সাজদায় যেতে পারি না', 'বসে সালাত

আদায় করলে রুকু-সাজদায় সামনের দিকে ঝুঁকতে পারি না'—এমন অজুহাত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। শুয়ে শুয়ে, ইশারায় সালাত আদায় করার বিধানও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রেখেছেন। ফলে যতক্ষণ আমাদের সংবিৎ লোপ পাবে না, যতক্ষণ আমাদের সামনে পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ থাকছে, ততক্ষণ সালাত আদায় আমাদের জন্য অবশ্যই ফরজ।

এই সময়টায় ওজু করা নিয়ে একটু ভোগান্তি হতে পারে। এক্ষেত্রে পানি স্পর্শে নিষেধাজ্ঞা থাকলে আমরা তায়াম্মুমের মাধ্যমে ওজুর কাজ সারতে পারি। তায়াম্মুমের নিয়ম-কানুন আমরা আমাদের আলিম, উসতাজা কিংবা অনলাইনে থাকা প্রশিক্ষণের ভিডিওগুলো থেকে শিখে রাখতে পারি আগেভাগেই। এটা শেখাটা জরুরিও; কারণ, প্রসবের নিকটবর্তী সময়ে যে-কোনো সময় আমাদের তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা লাগতে পারে।

সময়টা যেহেতু বেশ নাজুক, তাই ধরে ধরে প্রতিটা সুন্নাহ, নফল সালাত আদায়ের দরকার নেই। আমরা কেবল প্রতি ওয়াক্তের ফরজ সালাত আদায় করতে পারি। পরিস্থির কারণে আমরা সালাতের ওয়াক্তের কথা ভুলেও যেতে পারি। তাই, কাউকে বলে রাখব—যেন তারা আমাদের সালাত এবং সালাতের ওয়াক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। 'এই সময়ে সালাত আদায় কঠিন'—এভাবে কখনোই ভাববেন না। মনে রাখবেন, আপনি যার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করবেন, তার কাছেই যাবতীয় জিনিস সহজ করার চাবিকাঠি।

ব্যথার উপশম

প্রসবকালীন সময়টাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই 'কষ্টের মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে (গর্ভে) ধারণ করেছে , এবং অনেক কষ্টে তাকে প্রসব করেছে।[১]

সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এবং প্রসব-যন্ত্রণার মাধ্যমে তাকে ভূমিষ্ট করা—পুরো প্রক্রিয়াটাই একটা বড়ো পরীক্ষার সময়। গর্ভবতী নারীর জন্যে তো অবশ্যই, তার পরিবার-পরিজনের জন্যেও। লম্বা সময় ধরে গর্ভধারণ এবং অকল্পনীয় অভিজ্ঞতার প্রসব-বেদনার ভেতর দিয়ে একজন মা সন্তানকে জন্ম দেন বলেই ইসলামে মায়ের মর্যাদা এত সমুন্নত। বাবার চাইতে অধিকতর বেশি।

> একজন সাহাবি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চান—কার অধিকার বেশি, বাবা না মায়ের?
>
> নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—
>
> 'তোমার মায়ের।'
>
> নবীজিকে আবার প্রশ্ন করা হলো—'তারপর?'
>
> নবীজি আবারও উত্তর দিলেন—

[১] সূরা আহকাফ, আয়াত : ১৫

> 'তোমার মায়ের।'
>
> পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো—'তারপর কার?'
>
> সে-বারও নবীজি বললেন—
>
> 'তোমার মায়ের।'
>
> চতুর্থবার যখন জিজ্ঞেস করা হলো—'তারপরে?'
>
> এইবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন—
>
> 'তোমার বাবার।'

একজন মা অবর্ণনীয় ব্যথা সহ্য করে সন্তান জন্মদান করেন বলেই তার মর্যাদা অন্য যে-কারও, এমনকি বাবার চাইতেও বহু বহু গুণ বেশি। যদি জন্মদানকে অত্যন্ত সহজ করা হতো, যদি প্রসব-বেদনা বলে কিছু না থাকত, মায়ের সাথে সন্তানের যে নাড়ির টান কিংবা ভালোবাসা আর মায়ার বাহুবন্ধন—এটা কখনো তৈরিই হতো না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাতেই সমস্ত জ্ঞান। তিনিই জানেন কাকে কী দ্বারা সম্মানিত করবেন। তিনি নারীকে সম্মানিত করেছেন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এবং প্রসব-বেদনা সহ্য করে জন্মদানের মাধ্যমে। বাবাকে সম্মানিত করেছেন দায়িত্ব বহনের দায়িত্ব দিয়ে।

আমরা সেই সময়গুলোর কথা ভাবতে পারি যখন চিকিৎসাবিদ্যার এত উন্নতি ঘটেনি। যখন ব্যথানাশক ওষুধের প্রচলন শুরু হয়নি, আবিষ্কার হয়নি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও। আজকের দিনে গর্ভের বাচ্চার শারীরিক উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে আমরা কয়েকটা যন্ত্রের সাহায্যে বের করে ফেলতে পারি এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার থাকলে তা নিতেও পারি; কিন্তু প্রাচীন যুগের নারীরা না এসব সুবিধাদি পেয়েছিলেন, না এসবের কথা কস্মিনকালে ভাবতে পেরেছিলেন। তথাপি কি তারা প্রসবযন্ত্রণা সহ্য করে সন্তান জন্মদানের কাজটা করে যাননি? যদি না যেতেন, মানবসভ্যতা তাহলে বহু বহু পূর্বে ধ্বংস হয়ে যেত। বস্তুত নারীর শরীরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রসবযন্ত্রণাকে সয়ে নেওয়ার উপযোগী করেই

তৈরি করেছেন। আর, বান্দার ওপর সামর্থ্যের বেশি কিছু তিনি কখনো চাপান না।

আজকাল সবকিছু এত সহজ আর সহজলভ্য যে—প্রসব কোথায় হবে আর কীভাবে হবে তা আগেই ঠিক করে ফেলা যায়। আমাদের নিজেদেরও এসব ভাবতে হয় না। আমাদের স্বামী, বাবা অথবা ভাইয়েরা এ-সবের বন্দোবস্ত করে ফেলেন। আমাদের মধ্যে যারা ন্যাচারাল ডেলিভারি বা প্রাকৃতিক প্রসবের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাদের একটা জিনিস নিয়ে খুব ভাবতে হয়—কীভাবে ব্যথা উপশম করা যায়। অনেকেই ওষুধের দ্বারস্থ হয়। আবার অনেকে ওষুধের দিকে যেতে চায় না। যারা ওষুধ ব্যতীতই ব্যথা উপশমের দিকে যেতে চায়, তাদের জন্য কার্যকরী কয়েকটা উপায় বিদ্যমান আছে, যেমন—উষ্ণ পানিতে গোসল করা, অ্যারোমাথেরাপি, টেনস মেশিন ব্যবহার করা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হওয়া।

ন্যাচারাল ডেলিভারি বা প্রাকৃতিক প্রসবের অনেক উপকারিতা আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বাচ্চাকে ওষুধের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখা, দ্রুত সময়ে মায়ের আরোগ্য লাভ করা ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ, প্রসবযন্ত্রণাকে ভীষণ ভয় পাওয়ার দরুন অপারেশানের মাধ্যমে (সি-সেকশান) বাচ্চা জন্ম দেওয়াটাকে প্রাধান্য দেন। এর কারণ হলো—ব্যথা সহ্য করা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে একেকজন নারীর শরীর একেক রকম অবস্থায় থাকে। কেউ প্রসবযন্ত্রণা বেশ সহজভাবে নিতে পারে, ফলে তারা প্রাকৃতিক জন্মদানের দিকে ঝুঁকে থাকেন। অনেকের কাছে প্রসবযন্ত্রণা অত্যন্ত ভীতিকর একটা ব্যাপার। তারা বেছে নেন সি-সেকশান বা সিজার করাকে। এটা আসলে শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাভেদে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। আমরা যত বেশি মানিয়ে নিতে শিখব, ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতাও আমাদের ততই বৃদ্ধি পাবে, ইন শা আল্লাহ।

প্রসবকালীন সময়ে বা তার আগে ব্যথানাশক ওষুধ ব্যবহারের উপকারিতা এবং অপকারিতা দুই-ই আছে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমরা সকলে একমত যে—যা কিছু নিজেদের জন্য এবং আমাদের

সন্তানদের জন্য ক্ষতিকর, তার সমস্তটাই আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। মুসলিম হিসেবে এটা তো একেবারে ফরজ। সুতরাং, যে-কোনো ওষুধ, ইনজেকশান কিংবা ব্যথানাশক যে-কোনো কিছু গ্রহণে আমরা অত্যধিক সতর্ক থাকব এবং সর্বদা চিকিৎসক অথবা অভিজ্ঞ ধাত্রীর পরামর্শের মধ্যে থাকব।

মোদ্দাকথা, নিজেদের জন্য এবং সন্তানদের জন্য যেভাবে করলে উপকার আর কল্যাণ আসবে, সেভাবেই আমাদের চিন্তা আর কাজগুলো ধাবিত করা উচিত। আমরা যদি দৃঢ়চেতা হই যে—যত যা-কিছুই হোক, আমি কোনোভাবেই ব্যথানাশক ওষুধ বা মেডিসিন নেব না, তাহলে অত্যন্ত গুরুতর আর প্রয়োজনের মুহূর্তগুলোতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঝুলে থাকে জেদের কারণে। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা এবং সন্তান দুজনেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ থেকে যায়।

প্রথম কান্না : শয়তানের ওপর অভিশাপ!

প্রায় সব বাচ্চাই জন্মের পর পরই কেঁদে ওঠে। কী এমন ঘটে—যার কারণে তারা কেঁদে ওঠে ভীষণভাবে? এই উত্তর পাওয়া যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা হাদিসে। তিনি বলেছেন—

> 'এমন কোনো আদমসন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তবে মারইয়াম এবং তার ছেলে (ঈসা আলাইহিস সালাম)-এর ব্যতিক্রম।'[১]

আমাদের সন্তানকে আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করার আগে তার গায়ে শয়তানের স্পর্শ লেগে যায়। শয়তান যে আমাদের প্রকাশ্য এবং সবচেয়ে বড়ো শত্রু, এই ঘটনা সেটাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'নিশ্চয়ই, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।'[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৩১
[২] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫

'শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করো। সে কেবল তার দলবলকে ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গী হয়।'[১]

সাধারণত শত্রু থেকে আমরা সর্বদা সাবধান থাকি এবং তার বিরুদ্ধে গড়ে তুলি সব রকমের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। বাচ্চা প্রসবের সময়ে শুধু আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, পরিবার-পরিজনেরাই উপস্থিত থাকেন তা নয়, অন্য সকলের সাথে সেখানে শয়তানও উপস্থিত থাকে। যে মুহূর্তে বাচ্চা জন্মে নেবে, সে মুহূর্তে শয়তান তাকে ছুঁয়ে দেবে। তবে, এমন মধুর এবং আনন্দময় মুহূর্ত থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করার দুইটা উপায়ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন। বাচ্চার জন্মের সময় শয়তান উপস্থিত থাকার হাদিসটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু। হাদিসটা বর্ণনার পর পরই তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটা তিলাওয়াত করেন—

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'এবং আমি তাঁর ও তাঁর সন্তানের জন্য শয়তানের কবল থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই।'[২]

প্রসবকালীন সময়টাতে যারা আমাদের আশেপাশে থাকবেন, তাদের আমরা বলে রাখব এই আয়াতটি ওই সময়ে বেশি বেশি তিলাওয়াত করার জন্যে। আশা করা যায় এতে করে বিতাড়িত শয়তানের ক্ষতি থেকে আমাদের সন্তান নিরাপদে থাকবে, ইন শা আল্লাহ।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো—সন্তান জন্মের পর তার কানে আজান দেওয়া বা তাকে আজানের শব্দ শোনানো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে জানা যায়, আজানের শব্দে শয়তান দূরে পালিয়ে যায়।[৩]

---

[১] সূরা ফাতির, আয়াত : ৬

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৬; সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৩১

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৮৯

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দৌহিত্র হাসান এবং হুসাইনের জন্য একটা বিশেষ দুআ পড়তেন। এই একই দুআ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাঁর দুই ছেলে ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্যেও পড়তেন। সেই দুআটি আমরা শিখে নিতে পারি এবং আমাদের নবজাতকের জন্য বেশি বেশি সেই দুআটি পড়তে পারি। দুআটি হলো—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ،
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

> আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাত দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।[১]

শয়তানের স্পর্শ থেকে আমরা আমাদের সন্তানকে বাঁচাতে পারব না। এটা তাদের তাকদির—যা ঘটবেই। এটা থেকে মুক্ত ছিলেন কেবল মারইয়াম আলাইহাস সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম। তবে, একেবারে প্রথম দিন থেকে সন্তানের পক্ষ হয়ে আমরা শয়তানের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে পারি। ভেস্তে দিতে পারি তার কূট-কৌশল। তাই আমাদের শয়তানের চক্রান্তগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নিজেদের বাঁচতে হবে তার কুমন্ত্রণা থেকে, সন্তানদেরও বাঁচাতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা করেছেন—

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

> সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, শয়তানের কৌশল বস্তুত দুর্বল।[২]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৩৭১
[২] সূরা আন-নিসা ৪ : ৭৬

নাড়ি ও নাড়িরজ্জু

বিশ্বাস করেন আর না-ই করেন—আমাদের বহুল আকাঙ্খিত এবং প্রতীক্ষিত সন্তান জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই কিন্তু প্রসব-প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায়নি। বাচ্চার জন্মের পর তার দেহ থেকে নাড়ি অপসারণ করা হয় যা গর্ভকালীন সময়ে ভ্রুণের জীবনের উৎস ছিল। নাড়ির সাথে থাকে একটা নাড়িরজ্জু এবং সেই রজ্জুটি থাকে বাচ্চার নাভিতেই। যদি হাসপাতালে আমরা সন্তান প্রসব করি, তাহলে বাড়িতে কেবল বাচ্চা নয়, বাচ্চার সাথে তার নাড়ি এবং নাড়িরজ্জুর কথাও কিন্তু মনে রাখতে হবে। তবে অবশ্যই তা বাচ্চার কাছ থেকে অপসারণের পর। কারণ, এই নাড়িরজ্জু বাচ্চার শরীরের একটা অংশ যা অপসারণের পরে সতর্কতার সাথে সেটাকে পুঁতে ফেলা অবশ্য কর্তব্য।

যারা বাচ্চা প্রসব করায় তারা এই কাজটা দায়িত্ব নিয়েই করে থাকে। নবজাতকদের নাড়ি তারা নিজ থেকেই সংরক্ষণে রাখেন। আমাদের কাজ শুধু তাদের বলে রাখা যে—যাওয়ার সময় নাড়ি আর নাড়িরজ্জুকে আমরা সাথে করে নিয়ে যেতে চাই। ধাত্রীকে আমরা একটা শক্তপোক্ত ব্যাগ বা পাত্র প্রদান দিয়ে রাখতে পারি বাচ্চার নাড়ি সংরক্ষণের সুবিধের জন্যে। নাড়িকে এমন জায়গায় এবং এমনভাবে পুঁতে ফেলতে হবে, যেখানে কোনো প্রাণী এটার কোনো রকম নাগাল পাবে না।

প্রসব-পরবর্তী আরও একটি বিষয়ে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সেটা হলো—নাড়ি বিচ্ছিন্ন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নাড়িরজ্জুকে এমন একটা মাধ্যম হিসেবে গর্ভে তৈরি করেছেন, যার মাধ্যমে বাচ্চারা গর্ভের জীবন থেকে দুনিয়ার জীবনে প্রবেশ করে।

নাড়িরজ্জু ও নাড়ির সাথে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় বাচ্চারা জন্ম নেয়—যাতে করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া শুরু করার জন্যে তৎক্ষণাৎ ফুসফুসের দরকার না পড়ে। জন্মের পর এই কাজটা নাড়ির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়; কারণ, তখনো নাড়িতে বাচ্চার শরীরের কিছু রক্ত ধারণ করা থাকে। এই ধারণকৃত রক্তে থাকা অক্সিজেন নাড়িরজ্জুর মাধ্যমে বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে। তারপর ধীরে ধীরে বাচ্চা নাড়িতে থাকা রক্তের ওপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনে এবং একসময় সে নিজের দেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করতে শুরু করে। এই পুরো ব্যাপারটা ঘটতে কেবল কয়েক মিনিট সময় লাগে। তারপর নাড়ির স্পন্দন থেকে যায়।

কিন্তু বর্তমানের সাধারণ একটা চর্চা হলো বাচ্চা জন্মগ্রহণের সাথে সাথে নাড়ির স্পন্দন বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা না করেই তা ক্লিপ দিয়ে বেঁধে দেওয়া এবং কেটে ফেলা। এক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া হয় যে—বাচ্চার ফুসফুস ধীরে ধীরে উত্তরণের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করা শুরু করে। জন্মের পর পরই তা স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে দেয় না। জন্মের পর পরই নাড়ি কেটে ফেলা এবং তা ক্লিপ দিয়ে বেঁধে দেওয়ার পক্ষে উপকারী কোনো গবেষণা পাওয়া যায় না। বরঞ্চ নাড়িরজ্জুর স্পন্দন বন্ধ হওয়ার পর তা কর্তন করা হলে আয়রণের ঘাটতি হ্রাস হয়, এনিমিয়া রোগের হাত থেকে বাঁচায়।

সন্তান প্রসবের এমন অনেক পদ্ধতিকে 'আদর্শ পদ্ধতি' বলে চালানো হয়—যা আদতে ভুল কিছু সিদ্ধান্তের ওপর দাঁড়িয়ে। যেমন, অনেক হাসপাতাল থেকে নারীদের পরামর্শ দেওয়া হয়—তারা যেন তাদের পানি ভাঙার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রসব প্রক্রিয়া শুরু করে। অথচ, 'সাইন্টিফিক এডভাইসরি কমিটি অব দ্য রয়াল কলেজ অব অবসটেট্রেশিয়ান এন্ড গাইনোকোলোজিস্ট (আরসিওজি) পরামর্শ দেয় যে—পানি ভাঙার পর সর্বোচ্চ ছিয়ানব্বই ঘণ্টা সময় দেওয়া প্রয়োজন। যাহোক, সব মিলিয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়াটাই সর্বদা কাম্য।

স্বাগত জানাই তোমায়!

যার জন্য আমাদের অযুত রাত্রি, নিযুত প্রহরের অপেক্ষা, অবশেষে সে এলো, আলহামদুলিল্লাহ! একজন নারীর জীবনে এর চেয়ে পরম আনন্দময় মুহূর্ত খুব কম আসে। এতদিনকার স্বপ্ন, কল্পনা-জল্পনা, গল্পের ডালাপালা যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো, সেই অঙ্কিত মুখখানা আজ আমাদের সামনে বাস্তবে উপস্থিত। কী সুন্দর পিটপিট চোখে সে তাকাচ্ছে! কী নরোম, তুলতুলে গা! কাঁদলে কী যে মায়া লাগে! আহা! আমার প্রিয় সন্তান, তোমাকে স্বাগত এ ভুবনে!

নতুন অতিথি আগমনের খুশির সাথে দুনিয়ার আর কোনো খুশির তুলনা হবে না। তবে, তার আগমনকে কেন্দ্র করে কয়েকটা দায়িত্ব ইসলাম আমাদের ওপর অর্পণ করেছে। আনন্দের আতিশয্যে আমরা যেন সেই দায়িত্ব ভুলে না যাই। এবার তাহলে জেনে নিই দায়িত্বগুলো কী কী—

আজান এবং ইকামাত

* নবজাতকের ডান কানে ধীরে ধীরে আজান দেওয়া এবং বাম কানে ইকামাত দেওয়া সুন্নাহ। নতুন বাবা-মায়েরা প্রায়ই স্বাভাবিকভাবে প্রথমবার তাদের সদ্য জন্মপ্রাপ্ত সন্তানকে দেখার সময় এবং তাকে কোলে তুলে নেওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে থাকেন। আমাদের নবজাতককে অভ্যর্থনা জানানোর এটি একটি সুন্দর উপায়। কারণ, যে প্রথম শব্দটি তারা শুনতে পাবে সেটা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম এবং তাঁর প্রতি আমাদের ঈমান। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবজাতক শিশুদের কানে

আজান দিতেন, যদিও তারা তার সন্তান ছিলেন না। তাই বাচ্চার বাবা যদি আজান দিতে না পারেন তাহলে আমরা পরিবারের অন্য সদস্যদের আজান দেওয়ার জন্য বলতে পারি, হতে পারেন তিনি দাদা/নানা, অথবা আমাদের ইমাম। যিনি আজান দেবেন তাকে বাচ্চা জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে। কারণ, বাচ্চার কানে সর্বপ্রথম আজানের শব্দ পৌঁছানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। আরও মনে রাখবেন যে, আজান শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেয়, যা বাচ্চা জন্মগ্রহণের সময় উপস্থিত থাকে।

তাহনিক

* নবজাতক শিশুর জিহ্বায় হালকাভাবে চাবানো নরম অথবা ভালোভাবে চাবানো একটি খেজুর দিতে হবে। এই সুন্নাহ পালনের দর্শন ও কারণ একটি গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, নবজাতকের জিহ্বায় চিনি জাতীয় দ্রব্য রাখা হলে সেটা তার কান্না থামায়, ব্যথার চেতনা কমায়, এবং হৃদস্পন্দনের হার হ্রাস করে। খেজুর ব্যবহার করা, বিশেষ করে মদিনার আজওয়া খেজুর ব্যবহার করা গেলে ভালো। কিছু বাবা-মা মধু ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। জেনে রাখবেন, বর্তমানে বারো মাসের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য মধুকে অনুপোযুক্ত ভাবা হয়। তাই বাচ্চার মুখে মধু না দিয়ে যদি খেজুর দেওয়া হয়, সেটাই উত্তম হবে। এটা সুন্নাহ এবং উপকারীও।

সপ্তম দিনের মধ্যে অথবা সপ্তম দিনে বাচ্চার নাম রাখা

* সাত দিনের মধ্যেই বাচ্চার নাম রেখে দেওয়া সুন্নাহ। মনে রাখবেন যেদিন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে সেদিন প্রথম দিন হিসেবে গণনা করা হয়। অনেকে এই দিনটাকে গণনা করতে চায় না।

কিন্তু ইসলামি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিন শুরু হয় মাগরিবের সময় থেকে। একটি সুন্দর, অর্থপূর্ণ, শিরক-মুক্ত নাম রাখা ভালো। সন্তান পুত্র হলে নবিদের নাম, সাহাবি, তাবিয়িদের নামের সাথে মিল রেখে রাখা যেতে পারে। সন্তান যদি কন্যা হয় তাহলে নবীদের মা, স্ত্রী অথবা কন্যাগণের নামেও আমরা তার নাম রাখতে পারি। নামকরণের দিনটিকে ঘিরে কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ইসলামে নেই।

আকিকা

* বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিনে বা সপ্তম দিনের পর একটি (পুত্রসন্তান হলে দুটি) প্রাণী কুরবানি দিতে হয়। ঈদের সময় কুরবানি দেওয়া হয়—এমন যে-কোনো প্রাণী আকিকা উপলক্ষ্যে কুরবানি দেওয়া যায়। এটি একটি সুন্নাহ, তবে পালন করতেই হবে—এমনকিছু নয়। আমরা যদি আকিকা দিতে অসমর্থ হই তাহলে আমাদের নিজেদের ও আমাদের সন্তানের জন্য এতে কোনো ক্ষতি হবে না। যদি একটি রহমতপ্রাপ্ত সুন্নাহ পালনে এবং একটি আকিকা দিতে আমরা সমর্থ হই, তাহলে বাচ্চা জন্মগ্রহণের পরপর, অথবা সাতদিনের দিন তা করে ফেলা উচিত। বিশেষ কোনো প্রয়োজন বা অসুস্থতা যদি জেঁকে বসে, তাহলে আরও পরে আকিকা করার অনুমতিও দেওয়া আছে।[১]
* বাচ্চার মাথা মুণ্ডন করা : সপ্তম দিনেই বাচ্চার মাথা মুণ্ডন করতে হবে। এর আগে করা যাবে না। বাচ্চা যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেই দিনকে প্রথম দিন ধরে সপ্তম দিন গণনা করতে হবে। সুতরাং আমাদের সন্তান যদি শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে পরের বৃহস্পতিবার হবে সপ্তম দিন। এটা ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই সুন্নাহ। মুণ্ডন করা চুল তারপর মেপে দেখতে

[১] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ১৫২২, মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ৭৬৬৯

হবে এবং এর সমপরিমাণ রূপা সাদাকা হিসেবে কাউকে প্রদান করতে হবে।

এবং...

সদ্যোজাত শিশুরা মায়ের সাথে শুয়ে থাকতে পছন্দ করে এবং মায়ের হৃদস্পন্দন শোনার মধ্যে স্বস্তি খুঁজে পায়। নবজাতকেরা তাদের দেহের তাপমাত্রা ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মায়ের সংস্পর্শে, গায়ের সাথে লাগোয়া অবস্থায় থাকলে তার দেহের তাপমাত্রা সঠিক মাত্রায় চলে আসে। মায়ের শরীরের স্পর্শ এবং উষ্ণতা তাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, উত্তেজনা কমায় এবং তাকে সাহায্য করে উত্তমরূপে ঘুমোতে। প্রি-ম্যাচিউর বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি উপকারী বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। জন্মের পরে যেসব বাচ্চাকে একা রাখা হয় তাদের চাইতে যারা মায়ের সংস্পর্শে থাকে তারা কান্নাকাটিও করে তুলনামূলক অনেক কম।

জন্মের পর পর বাচ্চারা বেশ সতর্ক থাকে, বিশেষ করে জন্মের প্রথম ঘণ্টা বা তার পরের কিছু সময়। এই সময়টা বাচ্চাকে স্তন্যপান শুরু করানোর জন্য যথেষ্ট উপযোগী। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, এই সময়টায় বাচ্চাকে যদি মায়ের খুব কাছে রেখে আসা হয়, বাচ্চা মায়ের স্তন খুঁজে নিতে পারে এবং স্তন্যপান শুরুও করতে পারে। বাচ্চার সাথে সুন্দর বন্ধন গঠনে এই ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলোও মূল্যায়ন করতে হবে।

সন্তান জন্মদানের এই মূল্যবান মুহূর্তকে আমরা কাজে লাগাতে পারি সদ্যোজাত শিশুকে আমাদের বাহুতে আগলে রেখে, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে, তার সাথে কথা বলে, আর তাকে জানাতে পারি যে—সে এখনো তার মায়ের কাছেই আছে।

প্রসবোত্তর সময়কাল

হাসপাতালের ব্যাগ গোছানোর পাশাপাশি মুসলিম নারীদের প্রসব এবং জন্মের প্রস্তুতির মধ্যে নিফাস বা প্রসবোত্তর রক্তপাতের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা রাখাও জরুরি। প্রসবোত্তর রক্তপাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক সাজানো একটি প্রক্রিয়া—যা প্রসবের পর জরায়ুতে অবশিষ্ট রক্ত, শ্লেষ্মা এবং অমরা বের করতে দেহকে সাহায্য করে। এসব ঘটনাকে ঘিরে অনেক কুসংস্কার, কু-প্রথা আর বিশ্বাস চালু আছে আমাদের সমাজে যার সাথে ইসলামের কোনো রকম সংযোগ নেই। তাই, নিফাস চলাকালীন সময়ে আমরা কোনো ধরনের কুসংস্কার নয়, প্রাধান্য দেব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দ্বীনকেই। ইসলাম যেভাবে নির্দেশনা দেয়, সেভাবে আমরা ব্যাপারগুলো সমাধা করার প্রস্তুতি রাখব, ইন শা আল্লাহ।

প্রসবোত্তর সময়ে অনেক নারী নিজের স্বাস্থ্যের কথা বেমালুম ভুলে যায়। মনে রাখতে হবে, আমাদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার ওপরে বাচ্চার স্বাস্থ্য আর ভালো থাকা অনেকখানি নির্ভর করে থাকে। যদি এই সময়টায় নিজেদের প্রতি আমরা বেখেয়াল হই, সেটার ভুক্তভোগী হবে আমাদের সদ্যোজাত সন্তানও।

দীর্ঘ নয় মাসের ক্লান্তি, অবসাদ এবং বিষণ্ণতা প্রসব-পরবর্তী সময়ে আরও ঝেঁকে বসাটাই স্বাভাবিক। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। এই ক্লান্তি, অবসাদ এবং বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি পেতে আমরা কয়েকটা বিষয়ে নজর রাখতে পারি, যথা—ভালো খাবার দাবার খাওয়া, ঠিকমতো এবং পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা, স্বামী এবং পরিবারের সকলের সাথে আনন্দঘন সময় অতিবাহিত করা, নিজের শখের কাজগুলো বেশি করে করা এবং পছন্দের

মানুষগুলোর সংস্পর্শে আসা ইত্যাদি। এই ব্যাপারগুলো নিশ্চিত করা গেলে প্রসবোত্তর ক্লান্তি, অবসাদ এবং বিষণ্ণতা থেকে অনেকাংশেই মুক্ত থাকা যাবে, ইন শা আল্লাহ।

প্রসবোত্তর সময়কালকে ঘিরে বেশকিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। যেমন চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণে বাচ্চার মা এটা খেতে পারবে না, ওটা খেতে পারবে না, এটা করতে পারবে না, ওটা করতে পারবে না ইত্যাদি। এ-সমস্ত বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। সুতরাং আমরাও এ-সব কু-সংস্কার থেকে মুক্ত থাকবো, ইন শা আল্লাহ। ইসলাম যা কিছু বাতলে দিয়েছে তার মধ্যেই কেবল কল্যাণ।

প্রসবোত্তর সময়কাল সম্পর্কে আরও কতিপয় ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যা জেনে নেওয়া দরকারি, যেমন—

সকলের জন্য নিফাস চল্লিশ দিনের হয়

নিফাস বা প্রসবোত্তর রক্তপাত সর্বদা চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। প্রত্যেক নারীর জন্য নিফাসের স্থায়িত্ব ভিন্ন হয়। এমনকি একজন নারীর দুই গর্ভাবস্থায় নিফাসের সময়কাল দুই রকমের হতে পারে। চল্লিশ দিন পর যদি আমাদের রক্তপাত বন্ধ হয়, তাহলে সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, এবং স্বামীর সাথে পুরোপুরি ঘনিষ্ঠ হওয়া—এই সব কিছু অবশ্যই শুরু করতে হবে। রক্তপাত যদি চল্লিশ দিনের আগে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যে সময় থেকে বন্ধ হয় ঠিক সেই সময় থেকেই পবিত্রতা অর্জন করে সালাত, সিয়াম শুরু করতে হবে। তবে, নিফাসের রক্তপাত যদি চল্লিশ দিন বা তারও বেশি সময়কাল ধরে চলতে থাকে, সেক্ষেত্রে কী হবে? ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহর মতে—নিফাসের সর্বোচ্চ সময়কাল হলো চল্লিশ দিন। কারও যদি চল্লিশ দিনের বেশি নিফাস থাকে, তা গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ একচল্লিশ দিন থেকেই তিনি পবিত্র হয়ে সালাত, সিয়াম শুরু করবেন। অন্যদিকে, ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর

অভিমত হলো—নিফাসের সর্বোচ্চ সময়কাল হলো ষাট দিনের।[১] আমরা যে মাজহাব অথবা ফিকহের অনুসরণ করি, সেই মাজহাব অথবা ফিকহের আলোকেই এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, ইন শা আল্লাহ।

প্রসবোত্তর নারী এবং নবজাতক হলো অপরিষ্কার এবং তাদের সংস্পর্শে থাকা সবকিছুই অপরিষ্কার

প্রসবোত্তর সময়কালে অনেকে বাচ্চা এবং বাচ্চার মাকে অপবিত্র ভাবেন। গ্রামগঞ্জে এসব কুসংস্কার বেশি প্রচলিত। অনেকের ধারণা—নবজাতক আর তার মায়ের সংস্পর্শে গেলে রোগ-বালাই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ-সবের কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। ঋতুচক্র চলাকালীন একজন নারী যে অবস্থায় থাকে, প্রসবোত্তর সময়কালেও ঠিক একই অবস্থায় থাকেন তিনি। ঋতুচক্রের সময়ে একজন নারী যদি অস্পর্শ্য হয়ে না থাকে, নিফাসের সময়কালে কেন হবে?

প্রসবোত্তর নারীকে অবশ্যই ঘরের ভেতর থাকতে হবে

অনেকের ধারণা, বাচ্চা জন্মদানের পর নিফাস চলাকালীন নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। এটা স্রেফ কুসংস্কার। অপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে ইসলামও নারীদের উৎসাহিত করে না; কিন্তু প্রয়োজন এবং দরকার মনে করলে একজন নারীর ঘরের বাইরে যেতে কোনো বাঁধা নেই। তবে তা যথাযথ পর্দা-আব্রুর সাথে। নিফাসের দোহাই দিয়ে নারীকে ঘরের বাইরে যেতে না দেওয়া অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নয়। যাদের বাচ্চা হাসপাতালে জন্ম নেয়, তারা তো ইতোমধ্যে ঘরের বাইরেই আছে। তাছাড়া, বাচ্চাকে হাসপাতালে নিতে হলে যদি মায়ের সঙ্গে যাওয়া লাগে, তখনো তো যেতে হবে। যারা বলে নিফাসে থাকা নারীরা ঘরের বাইরে যাবে না, এসব ঘটনাগুলোতে তাদের সমাধান কী? এ-সমস্ত কুসংস্কার থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের হিফাজত করেন, আমিন।

---

[১] আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ ৪১/৭-১০, ফাতহুল কাদির ১/১৬৬

একটি নতুন জীবনের শুরু

সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়ে গর্ভাকালীন সময়ের সুন্দর দিনগুলোর সমাপ্তি ঘটে। গর্ভে বাচ্চার নড়াচড়ার অনুভূতি পাওয়া, তার হৃদস্পন্দন শ্রবণ করা, তাকে কোলে নেওয়ার কল্পনা করা এবং তার জন্য নতুন নতুন জিনিস কেনার উচ্ছ্বাস—এই সব অনুভূতি অনেক সময় মনে পড়বে!

নিঃসন্দেহে মাতৃত্ব শুরু করার মাঝে আলাদা আনন্দ আছে। সম্পূর্ণ নতুন সত্তাকে দেখা ও তাকে আঁকড়ে ধরার অনুভূতির সাথে দুনিয়ার কোনো অনুভূতির তুলনা হবে না। গর্ভাবস্থার যন্ত্রণাগুলোর চাইতে স্বপ্নের সন্তানের সাথে পার করা এই আনন্দমুখর সময়গুলোর ওজন অনেক বেশি।

সবশেষে যে জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে তা হলো—বাচ্চা জন্মদানের পর আমাদের দায়িত্ব কমেনি, বরং বেড়েছে। এটা এমন এক দায়িত্ব—যা আমাদের আখিরাতের সাথেও সংযুক্ত। বাচ্চাকে শুধু ভালো খাওয়ানো, পরানো, দামি খেলনা কিনে দেওয়াই নয়, তাদের আদর্শ মুসলিম, আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে গড়ে তোলাই হবে আমাদের ব্রত। এর জন্যে নিজেদের যেমন শুধরে নিতে হবে, শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে, তেমনি তাদের প্রতিও রাখতে হবে সর্বোচ্চ খেয়াল। তারা যেন ভালো গুণাবলি রপ্ত করে, ভালো জিনিস শেখে। তারা যেন বিচ্যুত না হয় আল্লাহর রাস্তা থেকে। মৃত্যুর পরেও কেবল যে তিনটা উৎস থেকে আমাদের আমলনামাতে সাওয়াব যুক্ত হতে থাকে—নেককার সন্তানের দুআ সেগুলোর একটি।

হতে পারে, আখিরাতের সেই কঠিন দিনে আমাদের নেককার সন্তানই হয়ে উঠবে আমাদের নাজাতের কারণ, ইন শা আল্লাহ। সেই দিনটাই হবে বাবা-

মা হিসেবে আমাদের জন্য সর্বোচ্চ সার্থকতার। মহান রব আমাদের উত্তম বাবা-মা হয়ে ওঠার তাউফিক দান করেন, আমিন।

'আমরা কেন মা হতে চাই'—এই প্রশ্নটি খুবই আবশ্যকীয়, কেননা এর সাথে মা হতে চাওয়ার উদ্দেশ্য জড়িয়ে আছে। আর এই প্রশ্নটি তখনই আসে যখন কিনা মা হতে চাওয়ার ব্যাপারটি আমরা প্রথম বারের মত চিন্তা করি।

এই যে মা হতে চাওয়ার ইচ্ছা, এটার গুরুত্ব সর্বোচ্চ, কারণ:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যত বা ইচ্ছার উপর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে যা সে ইচ্ছা করে'।

সন্তান নিতে চাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর গুরুত্ব বিবেচনার জন্য আমরা নবিজী সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটার ওপর আলোকপাত করতে পারি। সন্তান ধারণের বেলায় যদি আমাদের উদ্দেশ্য উত্তম এবং পবিত্র হয়, তাহলে সন্তানদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমাদের আমলনামায় সওয়াব যুক্ত হতে থাকবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই যদি বাচ্চা নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ধরে নিতে পারি যে আমাদের গর্ভাবস্থা, সন্তান এবং তাদের সাথে কাটানো আমাদের জীবন—সবকিছুই ফলপ্রসূ হবে ইন শা আল্লাহ। আর মা হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর এই অশেষ রহমত অর্জনের দৃঢ় আস্থাই আমাদেরকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মাতৃত্ব একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সাধ এবং স্বপ্ন দিয়ে মাখামাখি। অযুত রাত্রি নিযুত প্রহরের অপেক্ষা। একটা তুলতুলে নরোম শরীর, ছোট ছোট আঙুল, মায়াময় মুখ আর আদো আদো বোল—সবকিছুতে কী যে নিঃসীম মুগ্ধতা! মাতৃত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত—বান্দার প্রতি অপরিসীম দয়া আর করুণার প্রকাশ। মাতৃত্ব শুধু আনন্দ আর আবেগকেই তাড়িত করে না, দায়িত্বকেও বড় করে তোলে।

একজন নারীর জীবনে সবচেয়ে সংবেদনশীল সময় হলো সন্তান গর্ভে ধারণের সময়টুকু। এই সময়ে তার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, তার স্বামী এবং অন্যদের সম্পর্ক কেমন হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে একটা যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি, একটা গোছানো পরিকল্পনার ওপরে। গর্ভকালীন সময়ের একাকীত্ব, অবসাদ এবং বিষণ্নতাকে ডিঙিয়ে কীভাবে একজন নারী আনন্দমুখর একটা সময় পার করবে, কীভাবে রবের সাথে গড়ে নিবে আরো মজবুত সম্পর্ক—সেসব নিয়ে যদি গোছানো একটা ছক পাওয়া যায়, কেমন হবে? 'মা হওয়ার দিনগুলোতে' বইটি ঠিক সেরকম একটা ছক যা সন্তান সম্ভবা একজন মুসলিম নারীকে এনে দাঁড় করাবে অন্যরকম মাতৃত্ব-অভিজ্ঞতার সামনে।